Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআনে বর্ণিত নবীদের ঘটনা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ঈশিকা আশরাফ

রোলঃ 227022494

২৮ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআনে বর্ণিত নবীদের ঘটনা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ঈশিকা আশরাফ

রোলঃ 227022494

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " কুরআনে বর্ণিত নবীদের ঘটনা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ঈশিকা আশরাফ, আইডিঃ 227022494 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " কুরআনে বর্ণিত নবীদের ঘটনা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।



(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২৮ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

ঈশিকা আশরাফ

আইডিঃ 227022494

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা‘আলার জন্য যিনি আমাদেরকে সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য কিতাব আল-কুরআন উপহার দিয়েছেন, যাতে রয়েছে হিদায়াত ও উপদেশ গ্রহণের হাজারো উপকরণ। বিশেষ করে কুরআনের সুন্দরতম কাসাস তথা ঘটনাবলী আমাদের উপদেশ ও নসীহত গ্রহণের অমীয় বাণী। কুরআনে অতীত কালের জাতি ও সম্প্রদায়সমূহের ঘটনাবলী এবং কাহিনীগুলো বর্ণনা করে তাদের প্রকৃতি, স্বভাব, পরিণতি ও পরিণামের দিক নির্দেশ করে। অতীত কালের ইতিহাস নির্ভর বিভিন্ন ঘটনা ও কিসসা বর্ণনা করা কুরআনের মূল উদ্দেশ্য নয়। তবে অতীত কালের ঐতিহাসিক কাহিনী ও ঘটনার সঠিক বর্ণনা কুরআনের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। সেই উপমা, উদাহরণ এবং কাহিনী চিত্রায়ণের উদ্দেশ্য হলো দ্বীনি দাওয়াতকে মানুষের নিকট হৃদয়গ্রাহী করে তুলে ধরা। কুরআনের প্রধান আলোচ্য বিষয়ের প্রাচীন জাতিসমূহ এবং প্রসিদ্ধ নবী-রাসূলগণের ঘটনাবলীর বিবরণ অন্যতম। এ সকল কাহিনীর মধ্যে মানব জাতির সর্বস্তরে চিরকাল উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণের বহুবিধ উপকরণ রয়েছে।

কুরআনে বর্ণিত কাসাস জীবন ও জগৎ সম্পর্কে মানব জাতির অতীত অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে মানুষ তার নিজের পূর্বধারণা, তার স্বজাতীয় অতীত ঘটনাবলী, কার্যক্রম ও ফলাফল পর্যালোচনা করেই ভবিষ্যত পরিকল্পনা গ্রহণ করে, সভ্যতার বিকাশ ঘটায়। মানব জাতির নৈতিক, ব্যক্তিগত, সামাজিক সম্পর্ক হোক, আর রাষ্ট্রীয় বা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক হোক অতীত ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করেই তাদের সুখ, দুঃখ, ভালো-মন্দের মাপকাঠি নির্ণীত হয়। কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন ব্যক্তি, সমাজ, জাতি ও সভ্যতার আলোচনা দ্বারা শিক্ষা প্রদানই আল্লাহ তা‘আলার উদ্দেশ্য।

নবীদের ঘটনা বর্ণনার উদ্দেশ্য

নবী-রাসূলদের কাহিনীর মধ্যে অনেক শিক্ষা বিদ্যমান। তাদের কাহিনীতে ফুটে উঠেছে তাওহীদপন্থীদের অবস্থা ও তাদের বিরোধীদের অবস্থান। কিভাবে তাদের কাউকে আল্লাহ নাজাত দিয়েছেন, আর অন্যদের কীভাবে ধ্বংস করেছেন। এ কাহিনীর

শিক্ষাগুলো জানার মাধ্যমে যে কোনো মানুষের পক্ষে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও শাস্তি কোথায় রয়েছে তা জানা সম্ভব হবে।

প্রশ্ন হতে পারে, পবিত্র কুরআনে বিগত নবীগণের ও ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি সমূহের কাহিনী বর্ণনার উদ্দেশ্য কি? এর জবাব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কুরআনে দিয়েছেন,

وَكُلاًّ نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاء الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِيْ هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَّذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

'আমরা পয়গম্বরদের এসব কাহিনী আপনার কাছে বর্ণনা করি, যা দ্বারা আমরা আপনার অন্তরকে সুদৃঢ় করি। আর এর মধ্যে এসেছে আপনার নিকটে সত্য, উপদেশ ও স্মরণীয় বস্তু সমূহ বিশ্বাসীদের জন্য' (হূদ ১১/১২০)।

অর্থাৎ এর উদ্দেশ্য হলো, যাতে আল্লাহর রাসূল ﷺ নবুওয়াতের গুরু দায়িত্ব বহন করার জন্য যেকোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হয়ে যান এবং তাঁর উম্মত এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কুরআনে বলেছেন,

فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ

"অতএব আপনি বর্ণনা করুন এসব কাহিনী যেন তারা চিন্তা গবেষণা করে।" (আরাফ-৭/১৭৬)

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেছেন,

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَاۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ ۖ وَ اِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ

"আমি তোমার নিকট সুন্দরতম কাহিনী বর্ণনা করছি, এ কুরআন তোমার কাছে প্রেরণ করার মাধ্যমে। যদিও তুমি এর পূর্বে অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।" (ইউসুফ ১২/০৩)

কুরআন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত। আল্লাহ তা'আলা এই কুরআনকে মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ ﷺ এর উপর নাযিল করেছেন এবং তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাদের নিকট এই সংবাদ কিংবা ঘটনাগুলো পাঠিয়েছেন। নবীদের ঘটনা জানা অনেকগুলো কারণে বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথমত, নবীদের ঘটনা সম্পর্কে জানা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ। আর আল্লাহ তা'আলার যেকোনো আদেশ পালন করা হচ্ছে ইবাদাহ। সুতরাং আম্বিয়া কেরামের জীবনী সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা হলো ইবাদাহ। রাসূল ﷺ এর কাছেও এটা একটা আদেশ ছিল যেন তিনি তা তাঁর উম্মাতের কাছে পৌঁছে দেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উম্মাত হিসেবে আমাদের উপরও এই দায়িত্ব এসে পৌঁছেছে যে, আমরা আমাদের

পূর্ববর্তী নবীদের কাহিনী সম্পর্কে জানবো এবং অন্যদেরকে এই তথ্যগুলো জানিয়ে দিব।

দ্বিতীয়ত, কুরআনে নবীদের কাহিনী নিছক বিনোদনের জন্য বর্ণনা করা হয়নি। বর্ণনা করা হয়েছে যেন আমরা এগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি।

তৃতীয়ত, আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেছেন,

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ

"তারা ছিলেন ওই সমস্ত ব্যক্তি, যাদেরকে আল্লাহ হিদায়াত করেছেন, কাজেই আপনি তাদের পথের অনুসরণ করুন।" (আন'আম ৬/৯০)

আমরা মানুষেরা সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্যের কারণে সবসময় কাউকে না কাউকে অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে থাকি। আমাদের প্রত্যেকেরই আদর্শ প্রয়োজন। আর শৈশবে এর গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। কেননা শৈশব থেকে একজন মানুষ যাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে, সে সবসময় তার মতোই হওয়ার চেষ্টা করে। সুতরাং আমাদের নতুন প্রজন্মের সামনে আমরা যদি আম্বিয়া কেরামদের আদর্শ, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবনী এবং সাহাবাদের আদর্শকে তুলে না আনতে পারি, তাহলে তারা সেখানে ভ্রান্ত কাউকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে বসতে পারে। অর্থাৎ আম্বিয়াদের পথ হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম পথ। সুতরাং হিদায়েত লাভ করার জন্য এই পথের অনুসরণ করার কোনো বিকল্প নেই।

চতুর্থ কারণ, আম্বিয়া কেরামদেরকে ভালোবাসা। কারো সম্পর্কে না জেনে কখনো তাকে গভীরভাবে ভালোবাসা যায়না; বরং তা হয় শুধু মুখের দাবি। সুতরাং আম্বিয়া কেরামদের সম্পর্কে আমরা যত বেশি জানবো, তাদের প্রতি সম্মান এবং ভালোবাসা তত বেশি বৃদ্ধি পাবে ইন শা আল্লাহ।

কুরআনে বর্ণিত নবীদের নাম

কুরআনে ২৫ জন আম্বিয়া কেরামের নাম উল্লেখ আছে। তারা হলেন-

আদম, নূহ, ইদরীস, হূদ, সালেহ, ইবরাহীম, লূত্ব, ইসমাঈল, ইসহাক্ব, ইয়াকুব, ইউসুফ, আইয়ুব, শু'আইব, মুসা, হারুন, ইউনুস, দাউদ, সুলায়মান, ইলিয়াস, আল-ইয়াসা', যুল-কিফ্ল, যাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া, ঈসা আ'লাইহিমুস সালাম ও মুহাম্মাদ ﷺ।

(ইবনু কাছীর, তাফসীর নিসা ২৬৪)

তাঁদের মধ্যে ইবরাহীম (আ.)- পূর্ব সকল নবী আদম ও নূহ (আ.) এর বংশধর এবং ইবরাহীম (আ.) পরবর্তী সকল নবী ও রাসূল ইবরাহীম (আ.) এর বংশধর।
উল্লেখ্য যে, সূরা তওবার ৩০ নং আয়াতে উযাইর এর নাম আসলেও তিনি নবী ছিলেন না; বরং একজন সৎকর্মশীল ব্যক্তি ছিলেন। ইমাম কুরতুবী (রহ.) বলেন, অত্যাচারী খৃষ্টান রাজা বুখতানছরের ভয়ে যখন ফিলিস্তিনের ইহুদীরা সবাই তাওরাত মাটিতে পুঁতে ফেলে এবং তাওরাত ভুলে যায়, তখন উযাইর তাওরাত মুখস্থ করে সবাইকে শোনান। তাতে অনেকে এটাকে অলৌকিক ভেবে তাকে 'ইবনুল্লাহ' বা আল্লাহর বেটা বলতে থাকে।

সৃষ্টির শুরু

বুখারা থেকে একদল লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এসে জানতে চাইলেন, "ইয়া রাসুলাল্লাহ, এই বিশ্বজগৎ কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে?" রাসূলুল্লাহ ﷺ জবাবে বললেন, শুরুতে কেবলমাত্র আল্লাহই ছিলেন এবং তাঁর সাথে কিছুই ছিল না। তখন তাঁর আরশ ছিল পানির উপর। অতঃপর তিনি কিতাবে সমস্ত কিছু লিপিবদ্ধ করলেন। আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি তাকে লেখার নির্দেশ দিয়েছেন। তৎক্ষনাৎ সে কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে তার সমস্ত কিছু কিতাবে লিপিবদ্ধ করল। অতঃপর তিনি আসমান এবং জমিনকে সৃষ্টি করলেন। এই আসমান এবং জমিন সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা এই সৃষ্টি জগতের তাক্বদীর লিপিবদ্ধ করেছেন। অর্থাৎ আমরা দুনিয়াতে যা কিছু পাব তা আসমান-জমিন সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর পূর্বে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে। সুতরাং এই রিযক্ব নিয়ে আমাদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বা উদ্বিগ্ন না হয়ে এর উপর সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

আসমান এবং জমিন সৃষ্টির পর আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতা এবং জ্বিনদের সৃষ্টি করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ফেরেশতারা হলেন নূরের তৈরি আর জিনদের সৃষ্টি করা হয়েছে আগুন দ্বারা। আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর প্রথম মানব হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করার পূর্বে ফেরেশতাদের ডেকে বললেন, আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি

বানাতে যাচ্ছি। মূলত ফেরেশতাদের সৃষ্টিই করা হয়েছিল আনুগত্য ও তাসবীহ-তাহলীল করার জন্য। তাই তারা আল্লাহ তা'আলার এই ইরাদা ও বাসনায় কিছুটা বিচলিত হয়ে আরজ করলেন, ইয়া আল্লাহ! আপনি কি এমন এক জাতিকে পৃথিবীতে আপনার প্রতিনিধি বানাতে চান, যারা সেখানে ফাসাদ সৃষ্টি করবে ও রক্ত ঝরাবে? আর আমরা তো আপনার তাসবীহ পাঠ করছি এবং আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। (বাক্বারাহ ২/৩০)

যেহেতু আল্লাহ তা'আলা তার প্রতিনিধি সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ভালো করেই জানতেন এবং এ কাজে তার বিশেষ রহস্য নিহিত ছিল, তাই ফেরেশতাদের এই আপাত যুক্তিগ্রাহ্য নিবেদনের জবাবে তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আমি যা জানি, তোমরা তা জানো না।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা মানবজাতিকে সম্মান দিয়ে কুরআনে বলেছেন,

هُوَ الَّذِىۡ خَلَقَ لَکُمۡ مَّا فِى الۡاَرۡضِ جَمِيۡعًا*

"তিনিই যমীনে যা আছে সব তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।" (বাক্বারাহ ২/২৯)

সবকিছু মানুষের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহর ইবাদাতের জন্য। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা মানুষকে মর্যাদা দিয়েছেন এবং মানুষের উপকারের জন্য অন্য সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং মানুষ হচ্ছে এই পৃথিবীর চূড়ান্ত সৃষ্টি। এই পৃথিবীকে গড়ার দায়িত্ব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা মানুষের উপর অর্পণ করেছেন। আল্লাহ তাআ'লা মানুষকে দামী করে সৃষ্টি করেছেন। কাজেই, এটা কখনোই উচিত নয় যে, দুনিয়াবি কোনো সম্পদ বা বস্তু লাভ করার জন্য আমরা মানুষকে ধ্বংস করব কিংবা হত্যা করব। মানুষের জীবনের দাম অত্যন্ত পবিত্র। এজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

"একজন মুসলিমের রক্ত আল্লাহর নিকট কা'বার থেকেও বেশি পবিত্র।" (সুনান ইবনু মাজাহ; হাদিস নং ৩৯৩২)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কুরআনে বলেছেন,

وَ لَقَدۡ کَرَّمۡنَا بَنِیۡۤ اٰدَمَ وَ حَمَلۡنٰهُمۡ فِی الۡبَرِّ وَ الۡبَحۡرِ وَ رَزَقۡنٰهُمۡ مِّنَ الطَّیِّبٰتِ وَ فَضَّلۡنٰهُمۡ عَلٰی کَثِیۡرٍ مِّمَّنۡ خَلَقۡنَا تَفۡضِیۡلًا

"আর আমি তো আদম সন্তানদের সম্মানিত করেছি এবং আমি তাদেরকে স্থলে ও সমুদ্রে বাহন দিয়েছি এবং তাদেরকে দিয়েছি উত্তম রিয্ক। আর আমি যা সৃষ্টি করেছি তাদের থেকে অনেকের উপর আমি তাদেরকে অনেক মর্যাদা দিয়েছি।" (১৭/৭০)

আদম (আ'লাইহিস সালাম)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা সমগ্র পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ থেকে সংগ্রহ করা এক মুঠো মাটি দ্বারা আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করেছেন। কাজেই সেখানে সাদা, কালো কিংবা গৌর বর্ণের মাটি ছিল। মূলত এ কারণেই আদম সন্তানেরা বিভিন্ন বর্ণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে থাকে, তাদের বৈশিষ্ট্য হয় ভিন্ন।

বিশ্ব ইতিহাসে প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী হিসেবে আল্লাহ পাক আদম (আ.)-কে নিজ দু'হাত দ্বারা সরাসরি সৃষ্টি করেন (ছ্বদ ৩৮/৭৫)। মাটির সকল উপাদানের সার-নির্যাস একত্রিত করে আঠালো ও পোড়ামাটির ন্যায় শুষ্ক মাটির তৈরী সুন্দরতম অবয়বে রূহ ফুঁকে দিয়ে আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করেছেন। এই রূহ প্রথমবারের মতো যখন আদম (আ.) এর দেহে প্রবেশ করল, তখন তিনি হাঁচি দিয়ে উঠলেন এবং বললেন আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তাঁর হাঁচির জবাবে বললেন "ইয়ারহামুকাল্লাহ"। অর্থাৎ "হে আদম, আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন।" সুতরাং শুরুর দিন থেকেই আল্লাহর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হয়েছে। এটিই হচ্ছে সর্বপ্রথম শিক্ষা যা আল্লাহ তাআ'লা আদম (আ.)-কে দিয়েছেন। [মু'মিনূন ২৩/১২; ছফফাত ৩৭/১১; রহমান ৫৫/১৪; তীন ৯৫/৪ ইত্যাদি।]

আদম (আ.) কে সৃষ্টি করার পর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আদম (আ.)-এর সাথে এবং সমস্ত আদম সন্তানের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করেছেন। আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন,

وَ اِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِیْۤ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَ اَشْهَدَهُمْ عَلٰۤی اَنْفُسِهِمْ ۚ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ؕ قَالُوْا بَلٰی ۛۚ شَهِدْنَا ۛۚ اَنْ تَقُوْلُوْا یَوْمَ الْقِیٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِیْنَ ۙ

"আর স্মরণ কর, যখন তোমার রব বনী-আদমের পৃষ্ঠদেশ হতে তাদের বংশধরকে বের করলেন এবং তাদেরকে তাদের নিজদের উপর সাক্ষী করলেন যে, 'আমি কি তোমাদের রব নই'? তারা বলল, 'হ্যাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিলাম।' যাতে কিয়ামতের দিন

তোমরা বলতে না পার যে, নিশ্চয় আমরা এ বিষয়ে অনবহিত ছিলাম।" (আরাফ ৭/১৭২)

অর্থাৎ আমরা প্রত্যেকেই সেদিন আল্লাহর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছি। এই চুক্তি হচ্ছে ফিতরাতের চুক্তি তথা আদি স্বভাবজাত অবস্থা বা স্বভাব ধর্ম। আমাদের প্রত্যেকেরই স্বভাবজাত ধর্ম হচ্ছে ইসলাম। অতঃপর আল্লাহ আদমকে সবকিছুর নাম শিক্ষা দিলেন। 'সবকিছুর নাম' বলতে পৃথিবীর সূচনা থেকে মহাপ্রলয় পর্যন্ত ছোট-বড় সকল সৃষ্টবস্তুর ইলম ও তা ব্যবহারের যোগ্যতা তাকে দিয়ে দেওয়া হলো। যা দিয়ে সৃষ্টবস্তু সমূহকে আদম ও বনু আদম নিজেদের অনুগত করতে পারে এবং তা থেকে ফায়দা হাসিল করতে পারে। এরপর আল্লাহ তাআ'লা ফেরেশতাদের এসমস্ত বস্তুসমূহের নাম জিজ্ঞেস করলেন। তারা বললেন, "আপনি পবিত্র। আমরা তো কোনোকিছুই জানি না, তবে আপনি আমাদের যা কিছু শিখিয়েছেন সেগুলো ব্যতীত। নিশ্চয়ই আপনি প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন।" আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বললেন, হে আদম! মালাইকাদের এসব বস্তুর নাম জানিয়ে দাও। তারপর যখন তিনি সেসবের নাম জানিয়ে দিলেন তখন আল্লাহ ফেরেশতাদের উদ্দেশ্যে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, "আসমান এবং জমিনের যাবতীয় গোপন বিষয় সম্পর্কে খুব ভালোভাবেই আমি অবগত রয়েছি এবং সেই সমস্ত বিষয়ও জানি, যা তোমরা প্রকাশ কর ও যা গোপন কর।"
এই ঘটনা থেকে আমাদের জন্যও একটি শিক্ষা রয়েছে। যখনই কোন বিষয়ে আমাদের বোধগম্য হয় না, তখনই আমাদের বোঝা উচিত যে, এরমধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার হিকমাহ বা বিচক্ষণতা রয়েছে।

প্রথম মানুষ আদি পিতা আদম (আ.)-কে আল্লাহ তাআ'লা সর্ব বিষয়ের জ্ঞান ও যোগ্যতা দান করেন এবং বিশ্বে আল্লাহর খিলাফত পরিচালনার মর্যাদায় অভিষিক্ত করেন। সাথে সাথে সকল সৃষ্ট বস্তুকে করে দেন মানুষের অনুগত (লুকমান ৩১/২০) ও সবকিছুর উপরে দেন মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব (ইসরা ১৭/৭০)। আর সেকারণেই জিন-ফেরেশতা সবাইকে মানুষের মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য আদমকে সিজদা করার আদেশ দেন। সবাই সে নির্দেশ মেনে নিয়েছিল। কিন্তু ইবলিস অহংকার বশে সে নির্দেশ অমান্য করায় চিরকালের মত অভিশপ্ত হয়ে যায় (বাক্বারাহ ২/৩৪)। অথচ সে ছিল বড় আলেম ও ইবাদতগুযার। সেকারণে জিন জাতির হওয়া সত্ত্বেও সে ফেরেশতাদের সঙ্গে বসবাস

করার অনুমতি পেয়েছিল ও তাদের নেতা হয়েছিল। ইবলিস কখনোই আল্লাহকে অস্বীকার করেনি। আল্লাহ সম্বন্ধে ইবলিসের অন্তরে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এমনকি জান্নাত থেকে বিতাড়িত হওয়ার পরও সে আল্লাহর কাছে অবকাশের জন্য দু'আ করছিল। কিন্তু আদমের উচ্চ মর্যাদা দেখে সে ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়ে। ফলে অহংকার বশে আদমকে সিজদা না করায় এবং আল্লাহ ভীতি না থাকায় সে আল্লাহর গযবে পতিত হয় এবং কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

আল্লাহ তাআ'লা কুরআনে বলেছেন,

قَالَ اَرَءَيْتَكَ هٰذَا الَّذِىْ كَرَّمْتَ عَلَىَّ ۫ لَئِنْ اَخَّرْتَنِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهٗۤ اِلَّا قَلِيْلًا

"সে বলল, ‘দেখুন, এ ব্যক্তি, যাকে আপনি আমার উপর সম্মান দিয়েছেন, যদি আপনি আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত সময় দেন, তবে অতি সামান্য সংখ্যক ছাড়া তার বংশধরদেরকে অবশ্যই পথভ্রষ্ট করে ছাড়ব।" (আল ইসরা ১৭/৬২)

সুতরাং ইবলিসের এই অহংকার এবং এই ঘটনার মাধ্যমে আমাদের সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। আজকাল মানুষ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করছে। ইবলিসের মতো নিজেদের খেয়াল-খুশি অনুযায়ী ইসলামকে সংযোজন-বিয়োজন করছে। সুতরাং আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত। আমরা যেন সেই সমস্ত মানুষদের মাধ্যমে প্রতারিত না হই, যারা শরীয়াহর স্পষ্ট নির্দেশনার বিরুদ্ধে নিজেদের খেয়াল-খুশিকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। নিজের যুক্তি দিয়ে ইসলামকে বিচার করতে গেলে তা আমাদেরকে ইসলামী সীমা থেকে বের করে দিবে এবং আমরা কুফফারদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।

উল্লেখ্য যে, আদম (আ.)-কে সিজদাহ করার জন্য আল্লাহর নির্দেশ ব্যক্তি আদম হিসেবে ছিল না, বরং ভবিষ্যত মানব জাতির প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে তাঁর প্রতি সম্মান জানানোর জন্য জিন ও ফিরিশতাদের সিজদা করতে বলা হয়েছিল। এই সিজদাহ কখনোই আদমের প্রতি ইবাদাত পর্যায়ের ছিল না। বরং তা ছিল মানবজাতির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন ও তাদেরকে সকল কাজে সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি দানের প্রতীকী ও সম্মান সূচক সিজদাহ মাত্র। তবে বর্তমানে আমাদের জন্য এই সম্মানসূচক সিজদাহ বৈধ নেই।

আদম (আ.) এর শ্রেষ্ঠত্বের কিছু কারণ হলো-

(১) আল্লাহ তাকে নিজ দু'হাতে সৃষ্টি করেছেন (ছোয়াদ ৩৮/৭৫)। (২) আল্লাহ নিজে তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দিয়েছেন (ছোয়াদ ৩৮/৭২)। (৩) আল্লাহ তাকে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিয়েছেন (বাক্বারাহ ২/৩১)। (৪) তাকে সিজদা করার জন্য আল্লাহ ফেরেশতাদের নির্দেশ দিয়েছেন (বাক্বারাহ ২/৩৪)। (৫) আদম একাই মাত্র মাটি থেকে সৃষ্ট। বাকি সবাই পিতা-মাতার মাধ্যমে সৃষ্ট। (সাজদাহ ৩২/৭-৯)

সিজদাহ অনুষ্ঠানের পর আল্লাহ তাআ'লা আদম (আ.) এর জুড়ি হিসেবে তার অবয়ব হতে একাংশ নিয়ে অর্থাৎ তার পাঁজর হতে তার স্ত্রী হাওয়া (আ.)-কে সৃষ্টি করলেন। আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন,

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّ نِسَآءً

"হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক নফ্স থেকে। আর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং তাদের থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী।" (আন-নিসা ৪/১)

আদম ও হাওয়া (আ.) জান্নাতে স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করছিলেন। শুধুমাত্র একটি গাছ তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। (বাক্বারাহ ২/৩৫)

অতঃপর শয়তান আদমকে ওয়াসওয়াসা বা কুমন্ত্রণা প্রদান করল। শয়তান কখনোই মানুষকে সরাসরি আল্লাহর অবাধ্য হতে বলেনা। বরং সে কৌশলে মানুষকে বিভ্রান্ত করে। সে প্রথমে তাদের খুব আপনজন বনে গেল এবং নানা কথায় তাদের ভুলাতে লাগল। এক পর্যায়ে সে বলল, আল্লাহ যে তোমাদেরকে ঐ গাছটির নিকটে যেতে নিষেধ করেছেন, তার কারণ হলো এই যে, তোমরা তাহলে ফেরেশতা হয়ে যাবে কিংবা তোমরা এখানে চিরস্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যাবে। সে অতঃপর কসম খেয়ে বলল যে, আমি অবশ্যই তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী। এভাবেই সে আদম ও হাওয়াকে সম্মত করে ফেলল এবং তার প্রতারণার জালে আটকে গিয়ে তারা উক্ত নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল আস্বাদন করল। ফলে সাথে সাথে তাদের গুপ্তাঙ্গ প্রকাশিত হয়ে পড়ল এবং তারা তড়িঘড়ি জান্নাতের গাছের পাতা সমূহ দিয়ে তা ঢাকতে লাগল। আল্লাহ তাদেরকে ডেকে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এ বৃক্ষ থেকে নিষেধ করিনি এবং বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? তখন তারা অনুতপ্ত হয়ে বলল,

قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِين-َ

'হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিজেদের উপর যুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন, তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব'।

আল্লাহ তখন বললেন, তোমরা (জান্নাত থেকে) নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু। তোমাদের অবস্থান হবে পৃথিবীতে এবং সেখানেই তোমরা একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত সম্পদরাজি ভোগ করবে'। তিনি আরও বললেন যে, 'তোমরা পৃথিবীতেই জীবনযাপন করবে, সেখানেই মৃত্যুবরণ করবে এবং সেখান থেকেই তোমরা পুনরুত্থিত হবে' (আ'রাফ ৭/২০-২৫)।

এই ঘটনা থেকে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা লাভ করতে পারি তা হচ্ছে, নগ্নতা মানুষের উপর শয়তানের প্রথম হামলা আজও পৃথিবীতে শয়তানের পদাংক অনুসারী ও ইবলীসের শিখন্ডীদের প্রথম কাজ হলো তথাকথিত ক্ষমতায়ন ও লিঙ্গ সমতার নামে নারীকে উলঙ্গ করে ঘরের বাইরে আনা ও তার সৌন্দর্য উপভোগ করা।

আদম ও হাওয়া (আ.) কে জান্নাত থেকে অবতরণের নির্দেশ তাদের অপরাধের শাস্তি স্বরূপ ছিলনা। কেননা এটা ছিল তওবা কবুলের পরের ঘটনা। অতএব এটা ছিল হয়তবা তাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দানের জন্য। বরং সঠিক কথা এই যে, এটা ছিল আল্লাহর পূর্ব নির্ধারিত ও দূরদর্শী পরিকল্পনারই অংশ। কেননা জান্নাত হলো কর্মফল লাভের স্থান, কর্মের স্থান নয়। তাছাড়া জান্নাতে মানুষের বংশ বৃদ্ধির সুযোগ নেই। এজন্য দুনিয়ায় নামিয়ে দেয়া জরুরী ছিল।

প্রথম বার আদেশ দানের পরে পুনরায় স্নেহ ও অনুগ্রহ মিশ্রিত আদেশ দিয়ে বললেন, 'তোমরা সবাই নেমে যাও'। অতঃপর পৃথিবীতে আল্লাহর খলীফা হওয়ার (বাক্বারাহ ২/৩০; ফাত্বির ৩৫/৩৯) মহান মর্যাদা প্রদান করে বললেন, 'তোমাদের নিকটে আমার পক্ষ থেকে হেদায়াত অবতীর্ণ হবে। যারা তার অনুসরণ করবে, তাদের জন্য কোন ভয় বা চিন্তার কারণ থাকবে না। কিন্তু যারা তা প্রত্যাখ্যান করবে ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে, তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী এবং সেখানে তারা অনন্তকাল ধরে অবস্থান করবে' (বাক্বারাহ ২/৩৮-৩৯)।

উল্লেখ্য যে, নবীগণ ছিলেন নিষ্পাপ এবং হযরত আদম (আ.)-ও ছিলেন নিঃসন্দেহে নিষ্পাপ। তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ভুল করেননি। বরং শয়তানের প্ররোচনায় প্রতারিত

হয়ে তিনি সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ বৃক্ষের নিকটবর্তী হওয়ার নিষেধাজ্ঞার কথাটি ভুলে গিয়েছিলেন। যেমন অন্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا- 'অতঃপর আদম ভুলে গেল এবং আমি তার মধ্যে (সংকল্পের) দৃঢ়তা পাইনি' (ত্বোয়াহা ২০/১১৫)। তাছাড়া উক্ত ঘটনার সময় তিনি নবী হননি বরং পদস্খলনের ঘটনার পরে আল্লাহ তাকে নবী মনোনীত করে দুনিয়ায় পাঠান ও হিদায়াত প্রদান করেন' (আ'রাফ ৭/১২২)।

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, ইবলীসের ক্ষেত্রে আল্লাহ বললেন, قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ- 'তুমি জান্নাত থেকে বেরিয়ে যাও। নিশ্চয়ই তুমি অভিশপ্ত' (হিজর ১৫/৩৪; আ'রাফ ৭/১৮)। অন্যদিকে আদম ও হাওয়ার ক্ষেত্রে বললেন, قُلْنَا اهْبِطُواْ مِنْهَا- ' তোমরা নেমে যাও' (বাক্বারাহ ২/৩৬, ৩৮; আ'রাফ ৭/২৪)। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইবলীস কখনোই আর জান্নাতে ফিরে আসতে পারবে না। কিন্তু বনু আদমের ঈমানদারগণ পুনরায় ফিরে আসতে পারবে ইনশাআল্লাহ।

আদম (আ.) এর পুত্রদ্বয়ের ঘটনা-

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলছেন, আপনি তাদেরকে (আহলে কিতাবদেরকে) আদমের দুই সন্তানের বৃত্তান্ত যথাযথভাবে শুনিয়ে দিন।
বিশেষ করে আহলে কিতাবদেরকে এই ঘটনা জানাতে বলার কারণ হচ্ছে, ইহুদীদের নিকট স্পষ্ট দলিল এবং প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তারা শুধুমাত্র প্রতিহিংসার কারণে আল্লাহর রাসূল ﷺ কে সর্বশেষ রাসূল হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল। আল্লাহ মূলত আদম (আ.) এর পুত্রদ্বয়ের বৃত্তান্ত বর্ণনা করে তাদেরকে শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। প্রতিহিংসার কারণে শয়তান আদম (আ.)- কে সিজদাহ্ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল, প্রতিহিংসার কারণে মদীনার ইহুদিরা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে সত্য নবী হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল এবং প্রতিহিংসার কারণেই আদমের দুই সন্তানের মধ্যে প্রথম মানব সন্তান হত্যাকাণ্ডের সেই ঘটনাটি ঘটেছিল।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বর্ণনা করেছেন,
"যখন তারা উভয়ে কুরবানী পেশ করল। অতঃপর তাদের একজনের কুরবানী কবুল হলো। কিন্তু অপরজনের কুরবানী কবুল হলো না। তখন একজন বলল, আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করব। জবাবে অপরজন বলল, আল্লাহ কেবলমাত্র আল্লাহভীরুদের

থেকেই কবুল করেন। যদি তুমি আমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে হাত বাড়াও, আমি তোমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে হাত বাড়াবো না। আমি বিশ্বপ্রভু আল্লাহকে ভয় করি। আমি মনে করি এর ফলে তুমি আমাকে হত্যার পাপ ও তোমার অন্যান্য পাপসমূহের বোঝা নিয়ে জাহান্নামবাসী হবে। আর সেটাই হলো অত্যাচারীদের কর্মফল। অতঃপর তার মন তাকে ভ্রাতৃহত্যায় প্ররোচিত করল এবং সে তাকে হত্যা করল। ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হলো। অতঃপর আল্লাহ একটি কাক পাঠালেন। যে মাটি খনন করতে লাগল এটা দেখানোর জন্য যে কিভাবে সে তার ভাইয়ের মৃতদেহ দাফন করবে। সে বলল, হায়! আমি কি এই কাকটির মতোও হতে পারলাম না, যাতে আমি আমার ভাইয়ের মৃতদেহ দাফন করতে পারি। অতঃপর সে অনুতপ্ত হলো।" (মায়িদাহ ৫/২৭-৩১)

এই ঘটনা থেকে আমাদের জন্য একটি বড় শিক্ষা হলো, একজন নেককার ব্যক্তি কখনোই কারো প্রতি যুলুম করতে চাইবেন না। বরং তিনি মাযলুম অবস্থায় নিহত হওয়াকে যালিম অবস্থায় বেঁচে থাকার উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন,

لاَ تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ، رواه البخاري

‘অন্যায়ভাবে কোন মানুষ নিহত হলে তাকে খুন করার পাপের একটা অংশ আদমের প্রথম পুত্রের আমলনামায় যুক্ত হয়। কেননা সেই-ই প্রথম হত্যাকান্ডের সূচনা করে’। [বুখারী হা/৩৩৩৫; মুসলিম, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ; মিশকাত হা/২১১ ‘ইল্ম’ অধ্যায়।]

তিনি আরও বলেন, ‘যে ব্যক্তির উপর তার ভাইয়ের সম্মানহানি বা অন্য কোনো প্রকারের যুলুম রয়েছে, সে যেন তার থেকে আজই তা মুক্ত করে নেয়, সেইদিন আসার আগে, যেদিন তার নিকটে দীনার ও দিরহাম (স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা) কিছুই থাকবে না (অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বে)। যদি তার নিকট কোন সৎকর্ম থাকে, তবে তার যুলুম পরিমাণ নেকী সেখান থেকে নিয়ে নেওয়া হবে। আর যদি তার কোন নেকী না থাকে, তাহলে মাযলুমের পাপ সমূহ নিয়ে যালিমের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে’।

[বুখারী হা/২৪৪৯; মিশকাত হা/৫১২৬ ‘শিষ্টাচার’ অধ্যায় ‘যুলুম’ অনুচ্ছেদ ২১।]

সবশেষে আমরা আলোচনা করছি, আদম (আ.) এর ইন্তিকালের ঘটনা।
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ‘তোমাদের দিনগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম দিন হ’ল জুম‘আর দিন। এ দিনেই আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে, এ দিনেই তার মৃত্যু হয়েছে এবং এ দিনেই ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে...’। [মুওয়াত্ত্বা, আবুদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/১৩৫৯; সনদ ছহীহ, ‘ছালাত’ অধ্যায় ‘জুম‘আ’ অনুচ্ছেদ]

আদম (আ.)-কে এক হাজার বছর বয়স দেওয়া হয়েছিল। রূহের জগতে দাউদ (আ.)-এর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তিনি নিজের বয়স থেকে ৪০ বছর তাকে দান করার ইচ্ছা করেন। ফলে আল্লাহ তা লিপিবদ্ধ করে রাখেন।
এরপরে আদম (আ.) দুনিয়াতে বসবাস শুরু করলেন এবং এভাবে বহু বছর গড়িয়ে গেল। অবশেষে তাঁর যখন ৯৬০ বছর বয়স হয়ে গেল, তখন মৃত্যুর ফেরেশতা মালাকুল মাউত তাঁর নিকট হাজির হয়ে তাকে প্রশ্ন করলেন আপনি কি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত?
আদম (আ.) বললেন, আমার তো আরও ৪০ বছর বেঁচে থাকার কথা। মৃত্যুর ফেরেশতা মালাকুল মাউত প্রশ্ন করলেন, আপনি কি আপনার আয়ু থেকে ৪০ বছর আপনার সন্তান দাউদকে দিয়ে দেননি?
আদম (আ.) অস্বীকার করলেন। মূলত তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। তিনি কখনোই মিথ্যা বলেননি। এই ভুলে যাওয়া মানুষের একটি স্বভাব। আর যেহেতু আদম (আ.) ভুলে গিয়েছিলেন তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।
সবশেষে আদম (আ.) নিজেকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার ইচ্ছার কাছে সমর্পণ করলেন এবং রূহ তাঁর দেহ ত্যাগ করল।
যেহেতু সেসময় মানুষদের কাছে দাফনের বিষয়টা একেবারেই নতুন বিষয় ছিল। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আসমান থেকে ফেরেশতাদের প্রেরণ করলেন এবং তারা আদম (আ.)-কে আখেরি গোসল করালেন এবং কবর খনন করে তাঁকে দাফন করলেন।

নূহ (আ'লাইহিস সালাম)

রাসূলুল্লাহ ﷺ আল-বুখারীতে বর্ণিত একটি হাদিসে বলেছেন, "আদম এবং নূহের মাঝে ছিল দশ শতাব্দী অথবা দশটি প্রজন্ম; যাদের প্রত্যেকেই ছিল মুসলিম।"

অর্থাৎ দশটি মুসলিম প্রজন্মের পর ধীরে ধীরে আদম সন্তানদের মধ্যে কুফর এবং শিরক শুরু হতে থাকে। আদম (আ'লাইহিস সালাম) ছিলেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার আম্বিয়াদের মধ্যে একজন সম্মানিত নবী। তিনি নিঃসন্দেহে তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং তার সন্তানদেরকেও তিনি তাওহিদের উপর প্রতিষ্ঠিত করে তুলছিলেন। তাহলে কীভাবে তার সন্তানদের মধ্যে শিরক প্রবেশ করল? এমনকি নূহ (আ.) এর সময়ে তারা সরাসরি মূর্তিপূজায় লিপ্ত ছিল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা নূহের সম্প্রদায়ের মূর্তিগুলোর ব্যাপারে কুরআনে উল্লেখ করে বলেছেন,

وَ قَالُوۡا لَا تَذَرُنَّ اٰلِہَتَکُمۡ وَ لَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَّ لَا سُوَاعًا ۬ۙ وَّ لَا یَغُوۡثَ وَ یَعُوۡقَ وَ نَسۡرًا

"আর তারা বলে, ‘তোমরা তোমাদের উপাস্যদের বর্জন করো না; বর্জন করো না ওয়াদ, সুওয়া‘, ইয়াগূছ, ইয়া‘উক ও নাসরকে’।" (নূহ ৭১/২৩)

এগুলো ছিল নূহ (আ.) এর পাঁচটি মূর্তির নাম, যেগুলো তাঁর সম্প্রদায় পূজা করত। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, এরা হচ্ছেন পাঁচজন পুণ্যবান ব্যক্তি। যাদের নামে তৈরিকৃত মূর্তিকে এবং তাদের সৌধগুলোকে নূহের সম্প্রদায় পূজা করা শুরু করেছিল এবং এভাবেই পৃথিবীতে শিরকের প্রচলন শুরু হয়।

আব্বাস (রা.) বুখারীতে বর্ণিত হাদীসে এই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন যে, এই পাঁচজন ব্যক্তি ছিলেন মূলত নূহের সম্প্রদায়ের কয়েকজন পুণ্যবান ব্যক্তি। এই পুণ্যবান ব্যক্তিদের মৃত্যুর পর শয়তান তাদের সম্প্রদায়ের প্রতি ওয়াসওয়াসা প্রদান করল। কুমন্ত্রণা প্রদান করল এই বলে যে, "এ সমস্ত ব্যক্তিরা যেসব স্থানে বসতেন, তোমরা সেসব স্থানে কিছু মূর্তি নির্মাণ করে তাদের নামেই সেই মূর্তিগুলোর নামকরণ করে দাও।"

সম্প্রদায়ের লোকেরা সেটাই করলো। কেননা আমরা উল্লেখ করেছি, এই ঘটনাটি ছিল এমন একটি সময়ে যখন আদম (আ.) এর সন্তানদের মধ্যে ধীরে ধীরে গুনাহ বৃদ্ধি হতে থাকে এবং তারা দ্বীন থেকে ক্রমশ দূরে সরে যেতে থাকে। তাদের মধ্যে মূর্খতা-অজ্ঞতা বিস্তার লাভ করছিল। সে সময় তাদের মধ্যে নেককার লোকদের সংখ্যাও ছিল

কম। এমন একটি সময়ে তাদের নেককার লোকদের যখন মৃত্যু হয়ে গেল তখন শয়তান প্ররোচনা দেয়ায় তারা সহজেই পথভ্রষ্ট হয়ে গেল।
শয়তান অত্যন্ত সুকৌশলী। ধাপে ধাপে, ধীরে ধীরে, ক্রমাগত প্ররোচনার মাধ্যমে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে সে অত্যন্ত পারদর্শী। কাজেই সরল পথ থেকে সামান্য বিচ্যুতিও একদিন অনেক বড় ক্ষতির কারণ হতে পারে।

শয়তান মানুষকে প্রথমে এই বলে প্ররোচনা দিয়েছিল যে, "এখন মানুষের মধ্যে ইবাদাতের আগ্রহ কমে গেছে। নেককার ব্যক্তিদের সংখ্যা কম; যখন তারা ছিলেন তখন তারা তোমাদের আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন। এখন কে তোমাদের নাসীহাহ প্রদান করবে?" বেশ সুন্দর একটি লক্ষ্য শয়তান মানুষের সামনে উপস্থাপন করল। কিন্তু এই লক্ষ্য পূরণের জন্য যেই পদ্ধতি, তাতে শয়তান গোলমাল লাগিয়ে দিল। সুতরাং লক্ষ্য ভালো হলেই হবে না; বরং তা পূরণ করার জন্য যেই পদ্ধতি আছে, সেটাও সঠিক হতে হবে।
এভাবে ক্রমাগত দিন যেতে যেতে এক সময় যেই প্রজন্ম মূর্তি নির্মাণ করেছিল তাদেরও মৃত্যু হয়ে গেল এবং ধীরে ধীরে মানুষের মধ্যে ইলম আরও লোপ পেয়ে গেল। এরপরেই শয়তান তাদেরকে সেই মূর্তিপূজায় লিপ্ত করে দিল। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের এই মূর্তিগুলো পরবর্তীতে আরবেও প্রচলিত হয়ে পড়ে।

ইবন জারী (রহ.) আলোচ্য আয়াতের তাফসীরে মুহাম্মদ ইবন কায়েস থেকে বর্ণনা করেছেন, "তারা ছিলেন আদম এবং নূহের মধ্যবর্তীকালীন নেককার ব্যক্তি। তাদের বেশ কিছু অনুসারী ছিল। তারপর যখন তাদের মৃত্যু হয়ে গেল, তখন তাদের অনুসারীরা বলল, আমরা যদি এদের মূর্তি নির্মাণ করে রাখি তাহলে তাদের কথা স্মরণ করে আমাদের ইবাদাতে আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। তখন তারা তাদের প্রতিকৃতি নির্মাণ করে রাখে। এরপর যখন সেই প্রজন্মেরও মৃত্যু হয়ে যায় এবং নতুন আরেকটি প্রজন্ম আসে, তখন শয়তান এই অজ্ঞতার সুযোগকে গ্রহণ করে। শয়তান তাদের এই বলে প্ররোচনা দেয় যে, লোকজন তো তাদেরই উপাসনা করত এবং তাদের উসিলাতেই বৃষ্টি প্রার্থনা করত। যেহেতু নতুন প্রজন্ম জানতো না যে কি কারণে এই মূর্তিগুলো নির্মাণ করা হয়েছিল, তাই তারা সরাসরি এই মূর্তিগুলো পূজা করতে শুরু করে দেয়।"

অতএব পৃথিবীর প্রাচীনতম শিরক হলো নেককার মানুষের কবর অথবা তাদের মূর্তিপূজা। বর্তমানেও আমাদের সমাজে আমরা দেখতে পাই, বিভিন্নভাবে মৃত পুণ্যবান ব্যক্তিদের নামে শিরক অহরহ প্রচলিত আছে। মাজার পূজা, কবর পূজা, মৃত ব্যক্তিকে মাধ্যম ধরে দু'আ করা, "আল্লাহকে পেতে হলে অমুক ব্যক্তিকে ধরতে হবে" এমন বাক্য বানিয়ে নেয়া, উসিলা ধরা ইত্যাদি শিরক বর্তমানেও চলছে। সুতরাং যারা শিক্ষা গ্রহণ করতে চান, তাদের জন্য নূহ (আ.) এর সম্প্রদায়ের ঘটনা থেকে বহু শিক্ষনীয় বিষয় আছে।

এভাবেই যখন পৃথিবীর বুকে শিরক বিস্তার লাভ করল তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা পৃথিবীর বুকে প্রথম রাসূল নির্বাচন করলেন। নূহ (আ.) ছিলেন পৃথিবীর বুকে প্রথম রাসূল। শুধু তাই নয়, নূহ (আ.) হচ্ছেন উ'লুল আযমদের অন্তর্ভুক্ত। উ'লুল আযমী মিনার রাসূল হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার কাছে সবচেয়ে মর্যাদাবান পাঁচজন রাসূল। তাদের মধ্যে নূহ (আ.) একজন। আর বাকি চারজন হলেন ইবরাহীম, মূসা, ঈসা (আ.) এবং মুহাম্মাদ ﷺ। তাদের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাবান হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদ ﷺ।

নূহ (আ.)-কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তাঁর কওমের কাছে কোন বার্তা দিয়ে প্রেরণ করেছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কুরআনেই দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَّأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ، يَغْفِرْ لَكُم مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللهِ إِذَا جَاءَ لاَ يُؤَخَّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُون

‘আমরা নূহকে তার কওমের নিকটে প্রেরণ করলাম তাদের উপরে মর্মান্তিক আযাব নাযিল হওয়ার পূর্বেই তাদেরকে সতর্ক করার জন্য’। ‘নূহ তাদেরকে বলল, হে আমার জাতি! আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী’। ‘এ বিষয়ে যে তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তাঁকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর’। ‘তাতে আল্লাহ তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিবেন। তবে এটা নিশ্চিত যে, আল্লাহর নির্ধারিত সময় যখন এসে যাবে, তখন তা এতটুকুও পিছানো হবে না। যদি তোমরা তা জানতে’ (নূহ ৭১/১-৪)।

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি, মানুষকে সতর্ক করে দেয়া, সাবধান করে দেয়াও দাওয়াহ'র একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শুধু পুরস্কারের কথা নয়, বরং শাস্তির সংবাদ জানানোও দাওয়াহ'র ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। আমরা অনেক সময় শুধুমাত্র পুরস্কারের কথা বলে থাকি, শাস্তির কথাগুলো এড়িয়ে যেতে চাই। আমরা অনেকে মনে করি এর মাধ্যমে দাওয়াহ'র ক্ষেত্রে কঠোরতা হয়ে যায়। তবে এই ধারণা ভুল। বাস্তবতা হচ্ছে, আমাদেরকে সুসংবাদ এবং শাস্তি দুটোই স্পষ্টভাবে মানুষের কাছে জানিয়ে দিতে হবে। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ

"আর অবশ্যই আমি নূহকে তার কওমের নিকট প্রেরণ করেছিলাম। অতঃপর সে বলল, হে আমার কওম, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ নেই। তবুও কি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে না?" (সূরা মু'মিনুন ২৩/২৩)

এটাই হচ্ছে সেই বার্তা যা প্রত্যেক নবী তাদের উম্মাহর কাছে প্রেরণ করেছিলেন। সুতরাং নূহ (আ.) এর বার্তা অত্যন্ত স্পষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত। তিনি তাঁর যে বার্তা তার উম্মাহর কাছে উপস্থাপন করেছেন তার মূল বক্তব্য হচ্ছে তাওহীদ তথা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার একত্ববাদ। পাশাপাশি সকল নবীগণ আরেকটি বিষয়ে নিজ নিজ কওমকে আহবান করতেন। তা হলো- فَاتَّقُوا اللهَ وَ اَطِيْعُوْنِ 'সুতরাং তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আমার (নবীর) আনুগত্য কর'। (শু'আরা ২৬/১০৮)

নূহ (আ.) এর দাওয়াতী পদ্ধতি সম্পর্কে কুরআনে উল্লেখ আছে,

قال رب انى دعوت قومى ليلا و نهار

"সে (নূহ আ.) বলল, 'হে আমার রব! আমি তো আমার কওমকে রাত-দিন আহবান করেছি।" (নূহ ৭১/৫)

ثُمَّ اِنِّیۡ دَعَوۡتُهُمۡ جِهَارًا ۙثُمَّ اِنِّیۡۤ اَعۡلَنۡتُ لَهُمۡ وَ اَسۡرَرۡتُ لَهُمۡ اِسۡرَارًا

"তারপর আমি তাদেরকে প্রকাশ্যে আহবান করেছি। অতঃপর তাদেরকে আমি জনসম্মুখে এবং অতি গোপনেও আহবান করেছি।"

সুতরাং কুরআনের বক্তব্যের মাধ্যমে আমরা জানতে পারছি, (নূহ আ.) তাঁর কওমকে শিরক থেকে ফেরানোর জন্য কতভাবে চেষ্টা করেছেন। তিনি রাত-দিন সবসময় দাওয়াহ করতেন। তিনি জনসম্মুখে তাদের সাথে কথা বলতেন, ব্যক্তিগতভাবেও তাদেরকে উপদেশ দিয়েছেন। যতগুলো উপায় সম্ভব তার সবগুলো নূহ (আ.) তাঁর কওমকে দাওয়াহ দেয়ার কাজে ব্যবহার করেছেন। আমাদের জন্য এই ঘটনা থেকে রয়েছে শিক্ষা। দাওয়াহ'র কাজে আমাদের উচিত হবে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাদের যা নিয়ামত দিয়েছেন তার সবটুকু সর্বোচ্চ উপায়ে কাজে লাগানো।

নূহ (আ.) তাদেরকে শিরক পরিত্যাগ করে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর ইবাদতে ফিরিয়ে আনার জন্য বান্দার উপরে আল্লাহর অসংখ্য অনুগ্রহ ও অগণিত নেয়ামতরাজির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন,

تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقا، وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجاً، وَاللهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتاً، ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجاً، وَاللهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطاً، لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلاً فِجَاجاً

'তোমরা কি লক্ষ্য কর না, আল্লাহ কিভাবে সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন'। 'সেখানে তিনি চন্দ্রকে রেখেছেন আলো রূপে এবং সূর্যকে রেখেছেন প্রদীপ রূপে'। 'আল্লাহ তোমাদেরকে মাটি থেকে উদ্গত করেছেন'। 'অতঃপর তাতে ফিরিয়ে নিবেন ও আবার পুনরুত্থিত করবেন'। 'আল্লাহ তোমাদের জন্য যমীনকে করেছেন বিছানা সদৃশ'। 'যাতে তোমরা চলাফেরা করতে পার প্রশস্ত রাস্তাসমূহে' (নূহ ৭১/১৫-২০)।

নূহ (আ.) দিনে-রাতে-গোপনে-প্রকাশ্যে অক্লান্তভাবে দাওয়াতী কাজ চালাতে থাকেন। কিন্তু ফলাফল হয় নিতান্ত নৈরাশ্যজনক। একেবারে সামান্য কিছু সমাজের দূর্বল শ্রেণীর মানুষ তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছিল। তাঁর দাওয়াতে অতিষ্ঠ হয়ে তার কওমের লোকেরা তাঁকে দেখলেই পালিয়ে যেত অথবা কানে আঙ্গুল দিত। আবার কখনো তাদের চেহারা কাপড় দিয়ে ঢেকে ফেলতো। তারা তাদের হঠকারিতা ও জিদে অটল থাকত এবং চরম ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করত' (নূহ ৭১/৬-৯)। এক সময় কওমের সর্দাররা লোকদের ডেকে বলল,

وَقَالُوا لاَ تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلاَ تَذَرُنَّ وَدّاً وَلاَ سُوَاعاً وَّلاَ يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرا ً

(খবরদার!) 'তোমরা তোমাদের পূর্ব পুরুষদের পূজিত উপাস্য ওয়াদ, সুওয়া', ইয়াগূছ, ইয়াউক্ব, নাসর-কে কখনোই পরিত্যাগ করবে না'। (এভাবে) 'তারা বহু লোককে পথভ্রষ্ট

করে এবং (তাদের ধনবল ও জনবল দিয়ে) নূহ-এর বিরুদ্ধে ভয়ানক সব চক্রান্ত শুরু করে’ (নূহ ৭১/২১-২৩)।

মুহাম্মদ বিন ইসহাক্ব (রহ.) বলেছেন,

ولم يلق نبى من قومه من الأذى مثل نوح إلا نبى قُتل

"নিহত কোনো নবী ব্যতীত অন্য কোনো নবী তাঁর কওমের নিকট থেকে নূহের মতো এতটা নির্যাতন ভোগ করেননি।" (ইবনে কাছীর, সূরা আরাফ ৫৯-৬২)

সুবহানআল্লাহ! এত অত্যাচার- অবজ্ঞার পরেও কিভাবে টিকে থাকা সম্ভব হলো? এর উত্তর হচ্ছে সবর। নিঃসন্দেহে নূহ (আ.) এর মধ্যে ছিল অসাধারণ সবর। তিনি সাড়ে নয়শত বছর যাবৎ এই সবরের পরিচয় দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর একটি হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি, নূহ (আ.) এর সম্প্রদায় এতটাই অবাধ্য ছিল যে, কিয়ামতের ময়দানে তারা আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান অবস্থাতেও তাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করার বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করবে এবং এই সময়ে উম্মাতি মুহাম্মাদি নূহ (আ.) এর পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করবে।

নূহ (আ.) তাদেরকে শতাব্দীর পর শতাব্দী অক্লান্তভাবে দাওয়াত দেওয়া সত্ত্বেও তারা ঈমান আনেনি। বরং পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠছিল। তাঁর সম্প্রদায়ের অনীহা, অবজ্ঞা, তাচ্ছিল্য এবং ঔদ্ধত্য ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ পর্যায়ে কওমের নেতারা বলল,

قَالُوْا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا نُوْحُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ

‘হে নূহ! যদি তুমি বিরত না হও, তবে পাথর মেরে তোমার মস্তক চূর্ণ করে দেওয়া হবে’ (শো‘আরা ২৬/১১৬)। তবুও বারবার আশাবাদী হয়ে তিনি সবাইকে দাওয়াত দিতে থাকেন। আর তাদের জন্য দো‘আ করে বলতে থাকেন,

رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِيْ إِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ

‘হে আমার পালনকর্তা! তুমি আমার কওমকে ক্ষমা কর। কেননা তারা জানে না।’ (তাফসীর কুরতুবী, সূরা নূহ)।

তাদের অহংকার ও অত্যাচার চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল এবং পাপ ষোলকলায় পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। ফলে এক পর্যায়ে নূহ (আ.) স্বীয় কওমকে ডেকে বললেন,

‘হে আমার কওম! যদি তোমাদের মাঝে আমার অবস্থিতি ও আল্লাহর আয়াত সমূহের মাধ্যমে তোমাদের উপদেশ দেওয়া ভারি বলে মনে হয়, তবে আমি আল্লাহর উপরে ভরসা করছি। এখন তোমরা তোমাদের যাবতীয় শক্তি একত্রিত কর ও তোমাদের শরীকদের সমবেত কর, যাতে তোমাদের মধ্যে কোনরূপ দ্বিধা-সংকোচ না থাকে। অতঃপর আমার ব্যাপারে একটা ফায়সালা করে ফেল এবং আমাকে মোটেও অবকাশ দিয়ো না’। ‘এরপরেও যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও। তবে জেনে রেখ, আমি তোমাদের কাছে কোনরূপ বিনিময় কামনা করি না। আমার বিনিময় কেবলমাত্র আল্লাহর নিকটেই রয়েছে। আর আমার প্রতি নির্দেশ রয়েছে যেন আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হই’। ‘কিন্তু তারপরও তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল...’ (ইউনুস ১০/৭১-৭৩)। বলা বাহুল্য যে, এটা ছিল কওমের দুরাচার নেতাদের প্রতি নূহ (আঃ)-এর ছুঁড়ে দেওয়া চ্যালেঞ্জ, যার মুকাবেলা করা তাদের পক্ষে আদৌ সম্ভব ছিল না।

এ সময় আল্লাহ পাক অহী নাযিল করে বলেন,

أَنَّهُ لَن يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلاَّ مَنْ قَدْ آمَنَ فَلاَ تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ

‘তোমার কওমের যারা ইতিমধ্যে ঈমান এনেছে, তারা ব্যতীত আর কেউ ঈমান আনবে না। অতএব তুমি ওদের কার্যকলাপে বিমর্ষ হয়ো না’ (হূদ ১১/৩৬)।

এভাবে আল্লাহর অহী মারফত তিনি যখন জেনে নিলেন যে, এরা কেউ আর ঈমান আনবে না। বরং কুফর, শিরক ও পথভ্রষ্টতার উপরেই ওরা যিদ করে থাকবে, তখন নিরাশ হয়ে তিনি প্রার্থনা করলেন,

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُوْنِ

‘হে আমার পালনকর্তা! আমাকে সাহায্য কর। কেননা ওরা আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছে’ (মুমিনূন ২৩/২৬)।

فَافْتَحْ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِيْ وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

‘অতএব তুমি আমার ও তাদের মাঝে চূড়ান্ত ফায়সালা করে দাও এবং আমাকে ও আমার সাথী মুমিনদেরকে তুমি (ওদের হাত থেকে) মুক্ত কর’ (শু‘আরা ২৬/১১৮)। তিনি স্বীয় প্রভুকে আহবান করে বললেন,

فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّيْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ

‘আমি অপারগ হয়ে গেছি। এক্ষণে তুমি ওদের বদলা নাও’ (ক্বামার ৫৪/১০)। তিনি অতঃপর চূড়ান্তভাবে বদ দু‘আ করে বললেন,

وَقَالَ نُوْحٌ رَّبِّ لاَ تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ دَيَّارًا، إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلاَ يَلِدُوْا إِلاَّ فَاجِرًا كَفَّارًا

‘হে আমার রব! পৃথিবীতে একজন কাফের গৃহবাসীকেও তুমি ছেড়ে দিয়ো না’। ‘যদি তুমি ওদের রেহাই দাও, তাহ’লে ওরা তোমার বান্দাদের পথভ্রষ্ট করবে এবং ওরা কোন সন্তান জন্ম দিবে না পাপাচারী ও কাফের ব্যতীত’ (নূহ ৭১/২৬-২৭)।

বলা বাহুল্য, নূহ (আ.)-এর এই দু‘আ আল্লাহ সাথে সাথে কবুল করেন। যার ফলে তারা ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হলো এবং কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় মুমিন নর-নারী মুক্তি পেলেন। বর্তমান পৃথিবীর সবাই তাদের বংশধর। আল্লাহ বলেন,

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْداً شَكُوْراً

‘তোমরা তাদের বংশধর, যাদেরকে আমরা নূহের সাথে (নৌকায়) সওয়ার করিয়েছিলাম। বস্তুত সে ছিল একজন কৃতজ্ঞ বান্দা’ (ইসরা ১৭/৩; ছাফফাত ৩৭/৭৭)।

আল্লাহ বলেন, ‘আমরা নূহকে প্রেরণ করেছিলাম তার সম্প্রদায়ের নিকট। সে তাদের মধ্যে পঞ্চাশ কম এক হাযার বছর অবস্থান করেছিল। অতঃপর তাদেরকে ‘তূফান’ (অর্থাৎ মহাপ্লাবন) গ্রাস করেছিল। আর তারা ছিল অত্যাচারী। (আনকাবূত ২৯/১৪)। ভূতলের উত্থিত পানি ছাড়াও তার সাথে যুক্ত হয়েছিল অবিরাম ধারে আকাশবন্যা। যেমন আল্লাহ বলেন, ‘অবশেষে যখন আমার হুকুম এসে পৌঁছল এবং ভূপৃষ্ঠ পানিতে উদ্বেলিত হয়ে উঠল (হূদ ৪০)। অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ، وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوْناً فَالْتَقَى الْمَاءَ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، تَجْرِيْ بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ، وَلَقَدْ تَّرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ

‘তখন আমরা খুলে দিলাম আকাশের দুয়ার সমূহ প্রবল বারিপাতের মাধ্যমে’। ‘এবং ভূমি থেকে প্রবাহিত করলাম নদী সমূহকে। অতঃপর উভয় পানি মিলিত হলো একটি পূর্ব নির্ধারিত কাজে (অর্থাৎ ডুবিয়ে মারার কাজে)’। ‘আমি নূহকে আরোহন করালাম

এক কাষ্ঠ ও পেরেক নির্মিত জলযানে'। 'যা চলত আমার দৃষ্টির সম্মুখে। এটা তার (অর্থাৎ আল্লাহর) পক্ষ থেকে প্রতিশোধ ছিল, যাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল'। 'আমরা একে নিদর্শন হিসাবে রেখে দিয়েছি। অতএব কোন চিন্তাশীল আছে কি'? (ক্বমার ৫৪/১১-১৫)। যে কারণে নূহ-পুত্র 'ইয়াম' পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েও রেহাই পায়নি (হূদ ৪৩)। কারণ সে ছিল কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত। ঐ সময় কোন কোন ঢেউ পাহাড়ের চূড়া হতেও উঁচু ছিল। অতঃপর প্লাবন বিধ্বংসীরূপ ধারণ করে এবং পাহাড়ের মত ঢেউয়ের মধ্য দিয়ে নৌকা চলতে থাকে।' (হূদ ৪২)

ইদরীস (আ'লাইহিস সালাম)

ইদরীস (আ.) সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কুরআনে বলেন, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيْسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا، وَرَفَعْنَاهُ مَكَاناً عَلِيّا- 'তুমি এই কিতাবে ইদরীসের কথা আলোচনা কর। নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন সত্যবাদী ও নবী। আমরা তাকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছিলাম (মারইয়াম ১৯/৫৬-৫৭)।

তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত নবী। তাঁর নামে বহু উপকথা তাফসীরের কিতাবসমূহে বর্ণিত হয়েছে। যে কারণে জনসাধারণ্যে তাঁর ব্যাপক পরিচিতি রয়েছে। হযরত ইদরীস (আ.) নূহ (আ.)-এর পূর্বের নবী ছিলেন, না পরের নবী ছিলেন এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তবে অধিকাংশ সাহাবীর মতে, তিনি নূহ (আ.)-এর পরের নবী ছিলেন। (তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন পৃঃ ৪৫২।)

সূরা মারইয়ামে হযরত ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক্ব, ইয়াকুব, হারুন, মুসা, যাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া, ঈসা ইবনে মারইয়াম ও ইদরীস (আ.) এর আলোচনা শেষে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন,

أُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَن خَرُّوْا سُجَّداً وَبُكِيّاً

'এঁরাই হলেন সেই সকল নবী, যাদেরকে নবীগণের মধ্য হতে আল্লাহ বিশেষভাবে অনুগৃহীত করেছেন। এঁরা আদমের বংশধর এবং যাদেরকে আমরা নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম তাদের বংশধর এবং ইবরাহীম ও ইসরাঈল (ইয়াকূব)-এর বংশধর এবং যাদেরকে আমরা (ইসলামের) সুপথ প্রদর্শন করেছি ও (ঈমানের জন্য)

মনোনীত করেছি তাদের বংশধর। তাদের কাছে যখন দয়াময় আল্লাহর আয়াত সমূহ পাঠ করা হত, তখন তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ত ও ক্রন্দন করত।' (মারইয়াম ১৯/৫৮)

অত্র আয়াতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, ইদরীস (আ.) হযরত নূহ (আ.)-এর পরের নবী ছিলেন। তবে নূহ ও ইদরীস হযরত আদম (আ.)-এর নিকটবর্তী নবী ছিলেন, যেমন ইবরাহীম (আ.) হযরত নূহ (আ.)-এর নিকটবর্তী এবং ইসমাঈল, ইসহাক্ব ও ইয়াকূব (আ.) হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নিকটবর্তী নবী ছিলেন। (কুরতুবী, মারইয়াম ৫৮-এর ব্যাখ্যা।) নূহ পরবর্তী সকল মানুষ হলেন নূহের বংশধর। (কুরতুবী, আ'রাফ ৫৯-এর ব্যাখ্যা; ইবনু কাছীর।)

উল্লেখ্য যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস, কা'ব আল-আহবার, সুদ্দী প্রমুখের বরাতে হযরত ইদরীস (আ.)-এর জান্নাত দেখতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ফেরেশতার মাধ্যমে সশরীরে আসমানে উত্থান ও ৪র্থ আসমানে মালাকুল মাউত কর্তৃক তাঁর জান কবয করা, অতঃপর সেখানেই অবস্থান করা ইত্যাদি বিষয়ে যেসব বর্ণনা তাফসীরের কিতাব সমূহে দেখতে পাওয়া যায়, তার সবই ভিত্তিহীন ইসরাঈলিয়াত মাত্র। (কুরতুবী, মারইয়াম ৫৭ আয়াতের টীকা।)

বর্ণিত আছে, হযরত ইদরীস (আ.) হলেন প্রথম মানব, যাঁকে মু'জিযা হিসেবে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও অংকবিজ্ঞান দান করা হয়েছিল। তিনিই সর্বপ্রথম মানব, যিনি আল্লাহর ইলহাম মতে কলমের সাহায্যে লিখন পদ্ধতি ও বস্ত্র সেলাই শিল্পের সূচনা করেন। তাঁর পূর্বে মানুষ সাধারণত পোশাক হিসেবে জীবজন্তুর চামড়া ব্যবহার করত। ওযন ও পরিমাপের পদ্ধতি তিনিই সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন এবং লোহা দ্বারা অস্ত্র-শস্ত্র তৈরীর পদ্ধতি আবিষ্কার ও তার ব্যবহার তাঁর আমল থেকেই শুরু হয়। তিনি অস্ত্র নির্মাণ করে ক্বাবীল গোত্রের বিরুদ্ধে জিহাদ করেন। (কুরতুবী, মারইয়াম ৫৬; তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন পৃঃ ৮৩৮।)

হূদ (আ'লাইহিস সালাম)

হূদ (আ.) দুর্ধর্ষ ও শক্তিশালী আদ জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। এটি এমন একটি জাতির ঘটনা যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে সমৃদ্ধি দিয়েছিলেন। দৈহিকভাবে তারা ছিল বলিষ্ঠ, সুঠাম আর দীর্ঘদেহী। জাতিগতভাবে তারা ছিল ধনী, সমৃদ্ধ, সম্পদশালী। কিন্তু মানসিকতাই তারা ছিল একটি অত্যাচারী জালিম জাতি। শুধু তাই নয়, তারা ছিল মুশরিক; যারা কওমে নূহের পর প্রথম জাতি হিসেবে দুনিয়ার বুকে শিরকের প্রচলন ঘটিয়েছিল। তাদের বলিষ্ঠ শারীরিক গঠন, শক্তি আর সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে তারা হয়ে উঠেছিল মারাত্মক অহংকারী এবং ঔদ্ধত্য। তারা এতটাই অহংকারী এবং বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল যে, যখন তাদের নবী তাদেরকে আল্লাহর আযাবের ব্যাপারে সতর্ক করলেন, তখন তারা বলল, "আমাদের চেয়ে শক্তিশালী আর কে আছে?" (ফুসসিলাত ৪১/১৫)

তাদের এই অহংকারে ফেটে পড়া উক্তির জবাব দিয়েছে স্বয়ং আল্লাহ বলেছেন,

اَوَ لَمۡ یَرَوۡا اَنَّ اللّٰہَ الَّذِیۡ خَلَقَہُمۡ ہُوَ اَشَدُّ مِنۡہُمۡ قُوَّۃً ؕ وَ کَانُوۡا بِاٰیٰتِنَا یَجۡحَدُوۡنَ ﴿﴾

"তবে কি তারা লক্ষ্য করেনা যে, নিশ্চয় আল্লাহ যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই তাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী? আর তারা আমার আয়াতগুলোকে অস্বীকার করত।" (ফুসসিলাত ৪১/১৫)

তাদের দুনিয়াবি শক্তি ও বস্তুগত প্রাচুর্যের কারণে তারা আল্লাহর আযাবকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। চূড়ান্ত আযাবে তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেয়ার আগে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তাদেরকে সংশোধিত হওয়ার জন্য তিনটি বছর সময় দিয়েছিলেন। তাদের সংশোধনের জন্য আল্লাহ বড় আযাবের পূর্বে ছোট আযাব দিয়েছিলেন। কিন্তু এরপরেও তারা নিজেদের সংশোধন করল না।

হূদ (আ.) ও তাঁর কওম আদ জাতির ঘটনা সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কুরআনে বলেছেন,

"আর আদ সম্প্রদায়ের নিকটে (আমরা প্রেরণ করেছিলাম) তাদের ভাই হূদকে। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের

কোন উপাস্য নেই। অতঃপর তোমরা কি আল্লাহভীরু হবে না? তার সম্প্রদায়ের কাফির নেতারা বলল, আমরা তোমাকে নির্বুদ্ধিতায় লিপ্ত দেখতে পাচ্ছি এবং আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত মনে করি। হূদ বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আমার মধ্যে কোন নির্বুদ্ধিতা নেই। বরং আমি বিশ্বপালকের প্রেরিত একজন রাসূল মাত্র। আমি তোমাদের নিকটে প্রতিপালকের পয়গাম সমূহ পৌঁছে দেই এবং আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী ও বিশ্বস্ত। তোমরা কি আশ্চর্য বোধ করছো যে, তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ হতে তোমাদের থেকেই একজনের নিকটে অহী এসেছে, যাতে সে তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করে? তোমরা স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তোমাদেরকে কওমে নূহের পরে নেতৃত্বে অভিষিক্ত করলেন ও তোমাদেরকে বিশালবপু করে সৃষ্টি করলেন। অতএব তোমরা আল্লাহর নেয়ামত সমূহ স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও। তারা বলল, তুমি কি আমাদের কাছে কেবল এজন্য এসেছো যে, আমরা শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত করি, আর আমাদের বাপ-দাদারা যাদের পূজা করত, তাদেরকে পরিত্যাগ করি? তাহলে নিয়ে এসো আমাদের কাছে (সেই আযাব), যার দুঃসংবাদ তুমি আমাদের শুনাচ্ছো, যদি তুমি সত্যবাদী হও। হূদ বলল, তোমাদের উপরে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে শাস্তি ও ক্রোধ অবধারিত হয়ে গেছে। তোমরা কেন আমার সাথে ঐসব নাম সম্পর্কে বিতর্ক করছো, যেগুলোর নামকরণ তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা করেছো? ঐসব উপাস্যদের সম্পর্কে আল্লাহ কোনো প্রমাণ নাযিল করেননি। অতএব অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি। অনন্তর আমরা তাকে ও তার সাথীদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে রক্ষা করলাম এবং যারা আমাদের আয়াত সমূহে মিথ্যারোপ করেছিল, তাদের মূলোৎপাটন করে দিলাম। বস্তুত তারা বিশ্বাসী ছিল না।" (আ'রাফ ৭/৬৫-৭২)

এই আদ জাতিকে এমনভাবে ধ্বংস করা হয়েছিল, যেমনভাবে দুনিয়ার আর কোনো জাতিকে ধ্বংস করা হয়নি। ফিরাউন ধ্বংস হয়েছে, কিন্তু তাদের পিরামিডগুলো এখনো টিকে আছে। গ্রীক সভ্যতা ধ্বংস হয়েছে, কিন্তু এখনো সেই সভ্যতার কিছুটা অবশিষ্ট আছে। পারস্য সভ্যতা, সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংস হওয়ার পরও অন্তত তাদের জনবসতীর সন্ধানটুকু পাওয়া যায়। কিন্তু আজ জাতিকে আল্লাহ এমন ভাবে ধ্বংস করে দিলেন যে, পরবর্তী লোকেদের এ কথা জানারই সুযোগ থাকলো না, তারা ঠিক কোন অঞ্চলে বসবাস করত। অথচ তারা ছিল এমন এক জাতি, যাদের সমতুল্য দুনিয়ার বুকে তাদের আগে কাউকেই সৃষ্টি করা হয়নি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলছেন,

الَّتِىۡ لَمۡ يُخۡلَقۡ مِثۡلُهَا فِى الۡبِلَادِ

"যার সমতুল্য কোন দেশে সৃষ্টি করা হয়নি।" (ফাজর ৮৯/০৮)

সবশেষে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা যখন কুরআনের মাধ্যমে আমাদেরকে জানিয়ে দিলেন এই আদ জাতি 'আল আহক্বাফ" অঞ্চলে বসবাস করত, শুধুমাত্র তখনই আমরা এ ব্যাপারে জানতে পেরেছি যে, এটিই হলো সেই অভিশপ্ত আদ জাতির জনবসতি। বর্তমানেও তা একটি জনবিরল মরুভূমি এলাকা।

মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক্ব বলেন, কওমে আদ-এর অমার্জনীয় হঠকারিতার ফলে প্রাথমিক গযব হিসেবে তিন বছর বৃষ্টিপাত বন্ধ থাকে। তাদের শস্যক্ষেত সমূহ শুষ্ক বালুকাময় মরুভূমিতে পরিণত হয়। বাগ-বাগিচা জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। এতদসত্ত্বেও তারা শিরক ও মূর্তিপূজা ত্যাগ করেনি। কিন্তু অবশেষে তারা বাধ্য হয়ে আল্লাহর কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করে। তখন আসমানে সাদা, কালো ও লাল মেঘ দেখা দেয় এবং গায়েবী আওয়াজ আসে যে, তোমরা কোনটি পছন্দ করো? লোকেরা কালো মেঘ কামনা করল। তখন কালো মেঘ এলো। লোকেরা তাকে স্বাগত জানিয়ে বলল, هَذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا 'এটি আমাদের বৃষ্টি দেবে'। জবাবে তাদের নবী হূদ (আ.) বললেন,

بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ، تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِرَبِّهَا

'বরং এটা সেই বস্তু যা তোমরা তাড়াতাড়ি চেয়েছিলে। এটা এমন বায়ু যার মধ্যে রয়েছে মর্মন্তুদ আযাব'। 'সে তার প্রভুর আদেশে সবাইকে ধ্বংস করে দেবে...'। (আহক্বাফ ৪৬/২৪, ২৫; ইবনু কাছীর, সূরা আ'রাফ ৭১।)

ফলে অবশেষে পরদিন ভোরে আল্লাহর চূড়ান্ত গযব নেমে আসে। সাত রাত্রি ও আট দিন ব্যাপী অনবরত ঝড়-তুফান বইতে থাকে। মেঘের বিকট গর্জন ও বজ্রাঘাতে বাড়ি-ঘর সব ধ্বসে যায়, প্রবল ঘুর্ণিঝড়ে গাছ-পালা সব উপড়ে যায়, মানুষ ও জীবজন্তু শূন্যে উত্থিত হয়ে সজোরে যমীনে পতিত হয় (ক্বমার ৫৪/২০; হাক্বক্বহ ৬৯/৬-৮) এবং এভাবেই শক্তিশালী ও সুঠাম দেহের অধিকারী বিশালবপু আদ জাতি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন, এছাড়াও তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী অভিসম্পাৎ দুনিয়া ও আখিরাতে (হূদ ১১/৬০)।

আয়িশাহ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মেঘ বা ঝড় দেখতেন, তখন তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে যেত এবং বলতেন হে আয়িশাহ! এই মেঘ ও তার মধ্যকার ঝঞ্ঝাবায়ু দিয়েই একটি সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা হয়েছে। যারা মেঘ দেখে খুশি হয়ে বলেছিল, 'এটি আমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করবে। (বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১৫১৩ 'ছালাত' অধ্যায়, 'ঝঞ্ঝা-বায়ু' অনুচ্ছেদ।)

রাসূলের এই ভয়ের তাৎপর্য ছিল এই যে, কিছু লোকের অন্যায়ের কারণে সকলের উপর এই ব্যাপক গযব নেমে আসতে পারে। যেমন- উহুদ যুদ্ধের দিন কয়েকজনের ভুলের কারণে সকলের উপর বিপদ নেমে আসে। সেদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেন,

وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لاَّتُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوْآ أَنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

'আর তোমরা ঐসব ফিতনা থেকে বেঁচে থাকো, যা বিশেষভাবে কেবল তাদের উপর পতিত হবে না, যারা তোমাদের মধ্যে যালেম। আর জেনে রাখো যে, আল্লাহর শাস্তি অত্যন্ত কঠোর।' (আনফাল ৮/২৫)

উল্লেখ্য যে, গযব নাযিলের প্রাক্কালেই আল্লাহ স্বীয় নবী হূদ (আ.) ও তাঁর ঈমানদার সাথীদের উক্ত এলাকা ছেড়ে চলে যাবার নির্দেশ দেন ও তাঁরা উক্ত আযাব থেকে রক্ষা পান (হূদ ১১/৫৮)। অতঃপর তিনি মক্কায় চলে যান ও সেখানেই ওফাত পান। (তাফসীর কুরতুবী, আ'রাফ ৬৫।)

তবে ইবনু কাছীর হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন যে, হূদ (আ.) ইয়ামেনেই কবরস্থ হয়েছেন। (তাফসীর ইবনে কাছীর, সূরা আ'রাফ ৬৫।)

এই ঘটনা থেকে আমাদের জন্য কিছু শিক্ষা হলো-

অহি-র বিধানকে অস্বীকার করা এবং অন্যায়ের উপর জিদ ও অহংকার প্রদর্শন করাই হলো পৃথিবীতে আল্লাহর গযব নাযিলের প্রধান কারণ। আল্লাহ প্রেরিত গযবের ধরন বিভিন্ন রূপ হতে পারে। কিন্তু সেই গযবকে ঠেকানোর ক্ষমতা মানুষের থাকে না। আল্লাহর বিধান লংঘনকারী ব্যক্তি বা সম্প্রদায় চূড়ান্ত বিচারে দুনিয়াতেই আল্লাহর গযবের শিকার হয়। উপরন্তু আখেরাতের আযাব তো থাকেই এবং তা হয় আরো কঠোর। (ক্বলাম ৬৮/৩৩)

সালিহ (আ'লাইহিস সালাম)

আদ জাতির ধ্বংসের প্রায় ৫০০ বছর পরে হযরত সালিহ (আ.) কওমে সামূদ-এর প্রতি নবী হিসাবে প্রেরিত হন। (তারীখুল আম্বিয়া ১/৪৯)
কওমে সামূদ আরবের উত্তর-পশ্চিম এলাকায় বসবাস করত। তাদের প্রধান শহরের নাম ছিল 'হিজর' যা শামদেশ অর্থাৎ সিরিয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্তমানে এটি 'মাদায়েনে সালিহ' বা সালিহ (আ'লাইহিস সালাম) এর শহর নামে পরিচিত। এই অঞ্চলটি একটি পাথরের অঞ্চল। আদ জাতির ধ্বংসের পর সামূদ জাতি তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়। তারাও আদ জাতির মত শক্তিশালী ও বীরের জাতি ছিল। তারা প্রস্তর খোদাই ও স্থাপত্য বিদ্যায় খুবই পারদর্শী ছিল। সমতল ভূমিতে বিশালকায় অট্টালিকা নির্মাণ ছাড়াও পর্বতগাত্র খোদাই করে তারা নানা রূপ প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করত। শক্ত পাথর কেটে পর্বতের গায়ে কিভাবে প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করতে হয় সেই শিল্প আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তাদেরকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি তাদের এই নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলছেন,
"আর স্মরণ কর, যখন আদ জাতির পর তিনি তোমাদেরকে স্থলাভিষিক্ত করলেন এবং তোমাদেরকে যমীনে আবাস দিলেন। তোমরা তার সমতল ভূমিতে প্রাসাদ নির্মাণ করছ এবং পাহাড় কেটে বাড়ি বানাচ্ছ। সুতরাং তোমরা আল্লাহর নিআমতসমূহকে স্মরণ কর এবং যমীনে ফাসাদকারীরূপে ঘুরে বেড়িয়ো না।" (আরাফ ৭/৭৪)

তারা মনে করত, যেহেতু তারা পর্বতের গায়ে পাথর খনন করে প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করেছে, তাই এগুলোকে কিছুতেই ধ্বংস করা সম্ভব নয়। তারা তাদের এই দুনিয়াবি দালানকোঠার কারণে নিজেদের আল্লাহর আযাব থেকে নিরাপদ মনে করত।
সামূদ জাতির প্রতি সালিহ (আ.) এর দাওয়াত সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কুরআনে বলছেন,
"সামূদ জাতি রাসুলকে অস্বীকার করেছিল। যখন তাদের ভাই সালিহ তাদেরকে বলেছিল, 'তোমরা কি তাকওয়া অবলম্বন করবে না'? 'নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল'; সুতরাং তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর। আর এর উপর আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না; আমার প্রতিদান কেবল সৃষ্টিকুলের রবের নিকট। তোমাদেরকে কি এখানে যা আছে তাতে

নিরাপদে ছেড়ে দেয়া হবে? উদ্যান ও ঝর্ণায়, আর ক্ষেত-খামার ও কোমল শীষবিশিষ্ট খেজুর বাগানে? আর তোমরা নৈপুণ্যের সাথে পাহাড় কেটে বাড়ি নির্মাণ করছো। সুতরাং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর।" (শুআরা ২৬/১৪১-১৫০)

অর্থাৎ প্রত্যেক নবীর মতো সালিহ (আ.)-ও তাঁর জাতিকে প্রথমে তাওহীদের প্রতি আহবান করেছেন। পাশাপাশি তাদেরকে সংশোধিত হওয়ার জন্য এবং তাওবা-ইস্তিগফার করার জন্য উৎসাহিত করেছেন।

সাইয়্যিদিনা সালিহ (আ.) ছিলেন একজন বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ এবং শক্তিশালী যুবক। তিনি ছিলেন তাঁর সমাজের অভিজাত বংশের সন্তান। এ সমস্ত গুণাবলী থাকার কারণে সালিহ (আ.) এর জাতি (সামূদ জাতি) তাকে ভবিষ্যতে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য মুখিয়ে ছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই যখন এই ব্যক্তিটি তাদেরকে শিরক-মূর্তিপূজা ত্যাগ করে তাওহীদের দিকে আহবান করলেন তখন তাদের প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল?
কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলছেন,
قَالُوْا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِيْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَا إِلَيْهِ مُرِيْبٍ
"হে সালিহ! ইতিপূর্বে আপনি আমাদের কাছে আকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। আপনি কি বাপ-দাদার আমল থেকে চলে আসা উপাস্যদের পূজা করা থেকে আমাদের নিষেধ করছেন? অথচ আমরা আপনার দাওয়াতের বিষয়ে যথেষ্ট সন্দিহান।" (হূদ ১১/৬২)

সুবহানআল্লাহ! যেই মানুষটিকে ভবিষ্যতে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য তার নিজের জাতিই মুখিয়ে ছিল, ইতিপূর্বে যার বিচক্ষণতায় তারা আস্থা খুঁজে পেয়েছিল, সেই একই ব্যক্তি যখন তাদেরকে অন্ধভাবে বাপ-দাদার অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকতে বলল, তখন তারা কোনোরকম যাচাই-বাছাই ছাড়া অন্ধভাবে বাপ-দাদার ধর্মকেই আকড়ে ধরে থাকলো। তারা তাওহীদের দাওয়াতকে অস্বীকার করতে লাগলো এবং পূর্বের নবীদের মতো সালিহ (আ.)-কেও তারা বিভিন্ন অপবাদ দিতে শুরু করল। আল্লাহ বলেছেন,
قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ - مَآ اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۚ فَأْتِ بِاٰيَةٍ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ

"তারা বলল- 'তুমি তো কেবল যাদুগ্রস্তদের একজন। তুমি আমাদের মত মানুষ ছাড়া আর কিছুই না। কাজেই তুমি সত্যবাদী হলে একটা নিদর্শন হাজির কর।" (শুআরা ২৬/১৫৩-১৫৪)

ইবনু কাছীর বর্ণনা করেন যে, হযরত সালিহ (আ.)-এর নিরন্তর দাওয়াতে অতিষ্ঠ হয়ে সম্প্রদায়ের নেতারা স্থির করল যে, তাঁর কাছে এমন একটা বিষয় দাবী করতে হবে, যা পূরণ করতে তিনি ব্যর্থ হবেন এবং এর ফলে তাঁর দাওয়াতও বন্ধ হয়ে যাবে। সেমতে তারা এসে তাঁর নিকটে দাবী করল যে, আপনি যদি আল্লাহর সত্যিকারের নবী হন, তাহলে আমাদেরকে নিকটবর্তী পাহাড়ের ভিতর থেকে একটি দশ মাসের গর্ভবতী সবল ও স্বাস্থ্যবতী উষ্ট্রী বের করে এনে দেখান।

এ দাবী শুনে হযরত সালিহ (আ.) তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলেন যে, যদি তোমাদের দাবী পুরণ করা হয়, তবে তোমরা আমার নবুঅতের প্রতি ও আমার দাওয়াতের প্রতি ঈমান আনবে কি-না। জেনে রেখ, উক্ত মু'জিযা প্রদর্শনের পরেও যদি তোমরা ঈমান না আনো, তাহলে আল্লাহর গযবে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে'। এতে সবাই স্বীকৃত হলো ও উক্ত মর্মে অঙ্গীকার করল। তখন সালিহ (আ.) আল্লাহর নিকট দু'আ করলেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তার দু'আ কবুল করলেন এবং বললেন, إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ 'আমরা তাদের পরীক্ষার জন্য একটি উষ্ট্রী প্রেরণ করব। তুমি তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখ এবং ধৈর্য ধারণ কর' (ক্বমার ৫৪/২৭)। কিছুক্ষণের মধ্যেই পাহাড়ের গায়ে কম্পন দেখা দিল এবং একটি বিরাট প্রস্তর খন্ড বিস্ফোরিত হয়ে তার ভিতর থেকে কওমের নেতাদের দাবীর অনুরূপ একটি গর্ভবতী ও লাবণ্যবতী তরতাযা উষ্ট্রী বেরিয়ে এলো। অতঃপর সালিহ (আ.) পয়গম্বরসূলভ দয়া প্রকাশ করে বললেন,

هَـٰذِهِ نَاقَةُ اللهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوْهَا تَأْكُلْ فِيْ أَرْضِ اللهِ وَلاَ تَمَسُّوْهَا بِسُوْءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ
'এটি আল্লাহর উষ্ট্রী। তোমাদের জন্য নিদর্শন স্বরূপ। একে আল্লাহর যমীনে স্বাধীনভাবে চরে বেড়াতে দাও। সাবধান! একে অসৎ উদ্দেশ্যে স্পর্শ করো না। তাহলে তোমাদেরকে সত্বর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পাকড়াও করবে' (হূদ ১১/৬৪)।

আল্লাহ উক্ত উষ্ট্রীর জন্য এবং লোকদের জন্য পানি বণ্টন করে দিয়েছিলেন। একদিন উষ্ট্রীর ও পরেরদিন তাদের জন্য পানি পানের পালা নির্ধারিত হয়েছিল। (ক্বমার-২৮, শুআরা-১৫৫)

সামূদ জাতির লোকেরা যে কূপ থেকে পানি পান করত ও তাদের গবাদি পশুদের পানি পান করাত, এ উষ্ট্রীও সেই কূপ থেকে পানি পান করত। উষ্ট্রী যেদিন পানি পান করত, সেদিন কূয়ার পানি নিঃশেষে পান করে ফেলত। অবশ্য ঐদিন লোকেরা উষ্ট্রীর দুধ পান করত এবং বাকি দুধ দ্বারা তাদের সব পাত্র ভরে নিত। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তারা মারাত্মক ষড়যন্ত্র করতে শুরু করল। তারা উষ্ট্রীকে সরাসরি হত্যা করে ফেলার মনস্থ করল। কিন্তু আল্লাহর গযবের ভয়ে কেউ সাহস করছিল না। অবশেষে এক নিকৃষ্ট নাফরমান উষ্ট্রীটিকে তরবারি দ্বারা আঘাত করলে উষ্ট্রী মাটিতে পড়ে যায়। এরপর বাকিরা তাকে টুকরো টুকরো করে হত্যা করল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কুরআনে বলছেন,

فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَ عَتَوۡا عَنۡ اَمۡرِ رَبِّهِمۡ وَ قَالُوۡا یٰصٰلِحُ ائۡتِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ اِنۡ کُنۡتَ مِنَ الۡمُرۡسَلِیۡنَ -

فعقروا الناقة و عتوا عن امر ربهم و قالوا يصلح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين

"অতঃপর তারা উষ্ট্রীকে যবেহ করল এবং তাদের রবের আদেশ অমান্য করল। আর তারা বলল, 'হে সালিহ, তুমি আমাদেরকে যে ওয়াদা দিয়েছ, তা আমাদের কাছে নিয়ে এসো, যদি তুমি রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকো।" (আরাফ ৭/৭৭)

সুতরাং এই অবাধ্য সামূদ জাতি শুধু উটনীটিকে হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি। বরং দম্ভ ভরে তারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার আদেশকে অমান্য করেছে এবং ঔদ্ধত্যের সুরে তারা সালিহ (আ.)-কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলছে, তুমি যদি সত্যি আল্লাহর নবী হয়ে থাকো, তাহলে যেই আযাবের ভয় আমাদের দেখিয়েছিলে তা নিয়ে আসো। তারা এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথা বলেই ক্ষান্ত হয়নি; তারা আরও পরিকল্পনা করল, রাতে তারা সবাই একসাথে হামলা করবে এবং সালিহ (আ.) ও তাঁর পরিবারকে হত্যা করবে। (নামল ২৮/৪৯)

এরপর সালিহ (আ.) সামূদ জাতির বসতি থেকে বের হয়ে আসলেন এবং তার জাতিকে চূড়ান্তভাবে সতর্ক করে বললেন, "তোমাদের হাতে আর মাত্র তিনটি দিন অবশিষ্ট আছে। এর মধ্যে তোমরা যা উপভোগ করার করে নাও। এটি এমন এক ওয়াদা যা মিথ্যা হবার নয়।"

এভাবে তিনদিন পার হয়ে গেল। তৃতীয় রাতে সামূদ জাতির লোকেরা একে অপরের সাথে উপহাস করতে শুরু করল এবং বলল, "দেখো, সালিহ কত বড় মিথ্যুক। সে

তিনদিনের ওয়াদা দিয়েছিল। তিনদিন শেষ হয়ে গেছে। অথচ এখনো আযাবের কোনো পূর্বাভাস নেই।" অতঃপর পরদিন সূর্যোদয়ের সাথে সাথেই এক ভয়ংকর আওয়াজ এসে তাদের উপর আঘাত হানলো। (আল-হিজর ১৫/৭৩)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আরও বলেন,

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ

"তাদেরকে ভূমিকম্প পাকড়াও করল, তাই সকালে তারা তাদের গৃহে উপুড় হয়ে মরে রইল।" (১১/৬৭)

এখানে رَجْفَةٌ (ভূমিকম্প) এর কথা উল্লেখ হয়েছে। অন্যত্র صَيْحَةٌ (বিকট শব্দ) এর কথা উল্লেখ হয়েছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এই উভয় ধরনের আযাব তাদের উপর এসেছিল। উপর থেকে প্রচন্ড শব্দ এবং নীচে থেকে ভূমিকম্প। উভয় ধরনের এই আযাব তাদেরকে ধূলিসাৎ করে ছাড়ল।

ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ'লাইহিমাস সালাম)

ইবরাহীম (আ.) হচ্ছেন আবুল আম্বিয়া; অর্থাৎ নবীদের পিতা। তিনি হচ্ছেন উ'লুল আযমী মিনার রসূল। অর্থাৎ রাসূলদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পাঁচজনের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন ইবরাহীম (আ.)। তিনি ইহুদী-খ্রিষ্টানদের কাছে আব্রাহাম নামে পরিচিত। ইবরাহীম (আ.) জন্মগ্রহণ করেন ব্যাবিলনে বা বাবেল নামক শহরে এবং তিনি একজন অনারব নবী ছিলেন। ইবরাহীম (আ.) ছিলেন ইহুদী-খৃষ্টান-মুসলমান সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পিতা। কেননা আদম (আ.) হতে ইবরাহীম (আ.) পর্যন্ত ১০/১২ জন নবী বাদে শেষনবী মুহাম্মাদ ﷺ পর্যন্ত ১ লাখ ২৪ হাজার পয়গম্বরের প্রায় সকলেই ছিলেন ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধর। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

إِنَّ اللهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوْحاً وَآلَ إِبْرَاهِيْمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِيْنَ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ আদম, নূহ, আলে ইবরাহীম ও আলে ইমরানকে বিশ্ববাসীর উপরে নির্বাচিত করেছেন।' (আলে ইমরান ৩/৩৩)

এই নির্বাচন ছিল বিশ্ব সমাজে আল্লাহর তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য। ইবরাহীম ছিলেন নবীগণের পিতা এবং পুত্র মুহাম্মাদ ছিলেন নবীগণের নেতা, এ বিষয়টি সর্বদা মুমিনের মানসপটে জাগরুক রাখার জন্য দৈনিক স্বলাতের শেষ বৈঠকে পঠিত দরূদের মধ্যে ইবরাহীম ও মুহাম্মাদ ﷺ

উপরে এবং উভয়ের পরিবার বর্গের উপরে আল্লাহর অনুগ্রহ বর্ষণের জন্য দু‘আ করার বিধান রাখা হয়েছে।

ইবরাহীম ও তাঁর বংশধর সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِيْنَ

‘আমরা তাকে দান করলাম ইসহাক্ব ও ইয়াকূবকে এবং তার বংশধরগণের মধ্যে প্রদান করলাম নবুঅত ও কিতাব। তাকে আমরা দুনিয়াতে পুরষ্কৃত করলাম। নিশ্চয়ই পরকালে সে সৎ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে।’ (আনকাবূত ২৯/২৭)

ইবরাহীম (আ.) খুবই অল্পবয়স থেকে তাওহীদের দিকে মানুষকে আহবান করা শুরু করেন এবং এই কাজটি তিনি শুরু করেছিলেন তাঁর মুশরিক পিতাকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়ার মাধ্যমে। কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা এই ঘটনা উল্লেখ করে বলছেন,

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيْقاً نَّبِيًّا، إِذْ قَالَ لِأَبِيْهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لاَ يَسْمَعُ وَلاَ يُبْصِرُ وَلاَ يُغْنِي عَنكَ شَيْئاً، يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءنِيْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِيْ أَهْدِكَ صِرَاطاً سَوِيّاً، يَا أَبَتِ لاَ تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيّاً، يَا أَبَتِ إِنِّيْ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَن فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيّاً

‘তুমি এই কিতাবে ইবরাহীমের কথা বর্ণনা কর। নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন সত্যবাদী ও নবী। যখন তিনি তার পিতাকে বললেন, হে আমার পিতা! আপনি তার পূজা কেন করেন, যে শোনে না, দেখে না এবং আপনার কোনো উপকারে আসে না? হে আমার পিতা! আমার কাছে এমন জ্ঞান এসেছে, যা আপনার কাছে আসেনি। অতএব আপনি আমার অনুসরণ করুন। আমি আপনাকে সরল পথ দেখাবো। হে আমার পিতা! শয়তানের পূজা করবেন না। নিশ্চয়ই শয়তান দয়াময়ের অবাধ্য। হে আমার পিতা! আমি আশংকা করছি যে, দয়াময়ের একটি আযাব আপনাকে স্পর্শ করবে, অতঃপর আপনি শয়তানের বন্ধু হয়ে যাবেন।’ (মারইয়াম ১৯/৪১-৪৫)

মাত্র ১৬ বছর বয়সে তিনি তার পিতাকে তাওহীদের প্রতি দাওয়াত দিচ্ছেন। তিনি শুধুমাত্র তাঁর চেয়ে বয়সে বড় কাউকে দাওয়াত দিচ্ছেন তা নয়, বরং তিনি তাঁর নিজের পিতাকে বলছেন তাকে অনুসরণ করতে। এর কারণও তিনি নিজেই ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন, "আমার কাছে এমন জ্ঞান এসেছে, যা আপনার কাছে আসেনি।" কাজেই

এক্ষেত্রে পিতার উচিত হবে পুত্রের অনুসরণ করা। এখানে বয়সের তুলনায় ইলম প্রাধান্য পাবে। কিন্তু পুত্র ইবরাহীম (আ.) এর দাওয়াত তাঁর পিতা প্রত্যাখ্যান করে বললেন,

قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِيْ يَا إِبْرَاهِيْمُ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِيْ مَلِيًّا

‘হে ইবরাহীম! তুমি কি আমার উপাস্যদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছো? যদি তুমি বিরত না হও, তবে অবশ্যই আমি পাথরের আঘাতে তোমার প্রাণ নাশ করব। তুমি আমার সম্মুখ হতে চিরতরের জন্য দূর হয়ে যাও।’ (মারইয়াম ১৯/৪৬)

ইবরাহীম (আ.) তাঁর পিতাকে যেই পথে আহবান করেছিলেন তা ছিল সরল ও সত্যের পথ। কিন্তু ইবরাহীম (আ.) এর পিতা তা প্রত্যাখ্যান করলেন এবং তাকে হত্যারও হুমকি দিলেন। তারা উভয়েই নিজ নিজ দ্বীনকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছেন। তবে পার্থক্য এই যে, ইবরাহীম (আ.) ছিলেন হক্কের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁর পিতা ছিলেন মুশরিক, মূর্তিপূজক। পিতার এমন কঠোর ধমকি শুনে পুত্র ইবরাহীম (আ.) বললেন,

قَالَ سَلاَمٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيّاً

"তোমার উপরে শান্তি বর্ষিত হৌক! আমি আমার পালনকর্তার নিকটে তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। নিশ্চয়ই তিনি আমার প্রতি বড়ই অনুগ্রহশীল।" (মারইয়াম ১৯/৪৭)

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ইবরাহীম (আ.) এমন একজন ব্যক্তির জন্য দু'আ করছেন, যিনি কাফির। একজন ব্যক্তি যদি কুফরিতে অটল থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তবে তার জন্য দু'আ করা ইসলামে বৈধ নয়। কিন্তু ইবরাহীম (আ.) তখনও এই বিষয়টি জানতেন না। তিনি তাঁর পিতার জন্য ইস্তিগফার করার ওয়াদা করেছিলেন এবং তা করেও ফেলেছিলেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা পরবর্তীতে তাঁকে হক্কের শিক্ষা দিলেন। কুরআনে তিনি এই বিষয়টি আমাদের স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়ে বলেছেন,

وَ مَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَاۤ اِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗۤ اَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ ؕ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ

"নিজ পিতার জন্য ইবরাহীমের ক্ষমা প্রার্থনা তো ছিল একটি ওয়াদার কারণে, যে ওয়াদা সে তাকে দিয়েছিল। অতঃপর যখন তার নিকট স্পষ্ট হয়ে গেল যে, নিশ্চয় সে আল্লাহর শত্রু, সে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল। নিশ্চয় ইবরাহীম ছিল অধিক প্রার্থনাকারী ও সহনশীল।" (তাওবা ৯/১১৪)

যখন ইবরাহীম (আ.) তাঁর পিতাকে স্পষ্ট কুফরিতে অটল থাকতে দেখে তিনি তাঁর পিতার উদ্দেশ্যে বললেন,

وَ اَعۡتَزِلُکُمۡ وَ مَا تَدۡعُوۡنَ مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ وَ اَدۡعُوۡا رَبِّیۡ ۫ۖ عَسٰۤی اَلَّاۤ اَکُوۡنَ بِدُعَآءِ رَبِّیۡ شَقِیًّا

"আর আমি আপনাদের ও আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদাত আপনারা করেন তাদের পরিত্যাগ করছি এবং আমি আমার রবের ইবাদাত করছি। আশা করি আমার রবের ইবাদাত করে আমি ব্যর্থ হব না।" (মারইয়াম ১৯/৪৮)

এ ঘটনা থেকে আমাদের জন্য একটি বড় শিক্ষা হলো, মুসলিম হিসেবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাদের স্বতন্ত্র পরিচয় দিয়েছেন। ইসলামের মাধ্যমে তিনি আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন। এই মুসলিম পরিচয়কে আমাদের অবশ্যই সংরক্ষণ করতে হবে। জাহিলি সমাজের সমস্ত অবস্থায় আমরা নিজেদের স্রোতে ভাসিয়ে দিতে পারিনা। পশ্চিমাদের সাথে আমরা সকল ক্ষেত্রে মিলেমিশে থাকতে পারিনা।

স্বীয় পিতা ও সম্প্রদায়ের নিকটে ইবরাহীম (আ.) এর দাওয়াত ও তাদের জবাবকে আল্লাহ কুরআনে নিম্নরূপে বর্ণনা করেন। যেমন-

إِذْ قَالَ لِأَبِيْهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِيْ أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُوْنَ، قَالُوْا وَجَدْنَا آبَاءنَا لَهَا عَابِدِيْنَ، قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِيْ ضَلاَلٍ مُّبِيْنٍ، قَالُوْا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللاَّعِبِيْنَ، قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِيْ فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِيْنَ

"ইবরাহীম স্বীয় পিতা ও সম্প্রদায়কে বলল, এই মূর্তিগুলি কী যাদের তোমরা পূজারী হয়ে বসে আছো? তারা বলল, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে এরূপ পূজা করতে দেখেছি। সে বলল, তোমরা প্রকাশ্য গুমরাহীতে লিপ্ত আছো এবং তোমাদের বাপ-দাদারাও। তারা বলল, তুমি কি আমাদের কাছে সত্যসহ এসেছো, না কেবল কৌতুক করছো? সে বলল, না। তিনিই তোমাদের পালনকর্তা, যিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের পালনকর্তা, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন এবং আমি এ বিষয়ে তোমাদের উপর অন্যতম সাক্ষ্যদাতা।" (আম্বিয়া ২১/৫২-৫৬)

ইবরাহীম (আ.) তাদের সামনে আল্লাহর পরিচয় তুলে ধরে বলেন,

الَّذِيْ خَلَقَنِيْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ، وَالَّذِيْ هُوَ يُطْعِمُنِيْ وَيَسْقِيْنِ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ، وَالَّذِيْ يُمِيْتُنِيْ ثُمَّ يُحْيِيْنِ

"যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আমাকে পথ প্রদর্শন করেছেন।যিনি আমাকে আহার ও পানীয় দান করেন। যখন আমি পীড়িত হই, তখন তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন। যিনি আমার মৃত্যু ঘটাবেন, অতঃপর পুনর্জীবন দান করবেন।" (শুয়ারা ২৬/৭৮-৮১)

ইবরাহীম (আ.) এরপর মনে মনে বললেন,

وَتَاللهِ لَأَكِيْدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُوَلُّوْا مُدْبِرِيْنَ

"আল্লাহর কসম! যখন তোমরা ফিরে যাবে, তখন আমি তোমাদের মূর্তিগুলোর ব্যাপারে একটা কিছু করে ফেলব।" (আম্বিয়া ২১/৫৭)

ইবরাহীম (আ.) পরিকল্পনা করলেন যে তিনি তাদের সব মূর্তিগুলোকে ধ্বংস করে দিবেন। যাতে ওরা ফিরে এসে ওদের মিথ্যা উপাস্যদের অসহায়ত্বের বাস্তব দৃশ্য দেখতে পায়। হয়তবা এতে তাদের অনেকের মধ্যে হুঁশ ফিরবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান জাগ্রত হবে ও শিরক থেকে তওবা করবে। কয়েকজন মুশরিক তাঁর এই পরিকল্পনা শুনতে পেয়েছিল। তবে তৎক্ষনাৎ তারা বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়নি।

ইবরাহীম (আ.)-এর সম্প্রদায় বছরের একটা বিশেষ দিনে উৎসব পালন করত ও সেখানে নানারূপ অপচয় ও অশোভন কাজ করত। যেমন আজকাল প্রবৃত্তি পূজারী ও বস্তুবাদী লোকেরা করে থাকে কথিত সংস্কৃতির নামে। এইসব মেলায় সঙ্গত কারণেই কোন নবীর যোগদান করা সম্ভব নয়। কওমের লোকেরা তাকে উক্ত মেলায় যোগদানের আমন্ত্রণ জানালো। কিন্তু তিনি অসুস্থতার অজুহাত দেখিয়ে সেখানে যেতে অপারগতা প্রকাশ করলেন। (ছ্বফফাত ৩৭/৮৯)।

ইবরাহীম (আ.) শারীরিক ভাবে অসুস্থ ছিলেন না। বরং তিনি মূলত বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, তারা যেরূপ বেহায়পনা, নির্লজ্জপনা ও জাহিলি কাজকর্ম করছিলো তাতে তিনি বিরক্ত ও মানসিকভাবে অসুস্থ। কিন্তু তারা শারীরিক অসুস্থতার অর্থ ধরে নিয়ে নিজেদের উৎসবে চলে গেল।

এই সুযোগে ইবরাহীম (আ.) নিজ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মুশরিকদের উপাসনালয়ে প্রবেশ করলেন ও দেব-দেবীদের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, "(তোমাদের সামনে এত নযর-নেয়ায ও ভোগ-নৈবেদ্য রয়েছে)। অথচ তোমরা তা খাচ্ছো না কেন?

কি ব্যাপার, তোমরা কথা বলছো না কেন?" তারপর তিনি তাঁর ডান হাতে রাখা কুড়াল দিয়ে ভীষণ জোরে আঘাত করে সবগুলোকে গুঁড়িয়ে দিলেন। (ছ্বফফাত ৩৭/৯১-৯৩)। তবে বড় মূর্তিটাকে পূর্বাবস্থায় রেখে দিলেন এবং তার কাঁধে কুড়াল ঝুলিয়ে দিলেন, যাতে লোকেরা তার কাছে ফিরে যায়। (আম্বিয়া ২১/৫৮)

উৎসব শেষে লোকজন ফিরে এলো এবং যথারীতি তাদের উপাসনালয়ে গিয়ে প্রতিমাগুলির অবস্থা দেখে হতবাক হয়ে গেল। তারা বলাবলি করতে লাগল, এটা নিশ্চয়ই ইবরাহীমের কাজ হবে। কেননা তাকেই আমরা সবসময় মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে বলতে শুনি। কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা উক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করে বলেন,
قَالُوۡا مَنۡ فَعَلَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَاۤ اِنَّهٗ لَمِنَ الظّٰلِمِيۡنَ- قَالُوۡا سَمِعۡنَا فَتًى يَّذۡكُرُهُمۡ يُقَالُ لَهٗۤ اِبۡرٰهِيۡمُ- قَالُوۡا فَاۡتُوۡا بِهٖ عَلٰٓى اَعۡيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَشۡهَدُوۡنَ
"তারা বলল, ‘আমাদের দেবদেবীগুলোর সাথে কে এমনটি করল? নিশ্চয় সে যালিম। তাদের কেউ কেউ বলল, ‘আমরা শুনেছি এক যুবক এই মূর্তিগুলোর সমালোচনা করে। তাকে বলা হয় ইবরাহীম। তারা বলল, ‘তাহলে তাকে লোকজনের সামনে নিয়ে এসো, যাতে তারা দেখতে পারে।" (আম্বিয়া ২১/৫৯-৬১)

এভাবে ইবরাহীম (আ.)-এর মনের আশাই যেন পূরণ হলো। কারণ তিনি এটাই চাচ্ছিলেন। তিনি এটাই চাচ্ছিলেন যে, ব্যাপারটা যেন সাধারণ মানুষের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ুক। তারাও আসুক, দেখে নিক এই যে মূর্তিগুলোকে তাদের অভাব পূরণকারী হিসেবে রাখা হয়েছে এরা কতটা অসহায় এবং স্বয়ং পুরোহিতরাই এদের সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করে। [ইবন কাসীর]

অতঃপর ইবরাহীমকে সেখানে ডেকে আনা হলো এবং জিজ্ঞেস করল,
أَأَنتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيم؟
‘হে ইবরাহীম! তুমিই কি আমাদের উপাস্যদের সাথে এরূপ আচরণ করেছো? (আম্বিয়া ২১/৬২)।
ইবরাহীম (আ.) বললেন,
بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُوْنَ

"বরং এই বড় মূর্তিটাই এ কাজ করেছে। নইলে এদেরকে জিজ্ঞেস করো, যদি তারা কথা বলতে পারে।" (আম্বিয়া ২১/৬৩)।

এটাই ছিল ইবরাহীম (আ.) এর মূর্তি ভাঙ্গার মূল উদ্দেশ্য। তিনি সবার সামনে মূর্তিগুলো অসারতা স্পষ্ট করে তুলতে চেয়েছিলেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন,

فَرَجَعُوٓا اِلٰٓى اَنۡفُسِهِمۡ فَقَالُوٓا اِنَّكُمۡ اَنۡتُمُ الظّٰلِمُوۡنَ

"তখন তারা বিষয়টি নিয়ে মনে মনে চিন্তা করল এবং পরস্পর বলাবলি করল- তোমরা নিজেরাই তো অন্যায়কারী।" (আম্বিয়া ২১/৬৪)

ইবরাহীম (আ.) তাদের বাপ-দাদার অন্ধ অনুসরণ করার ভ্রান্তি ভেঙ্গে দিতে চেয়েছিলেন। এ ঘটনা ছিল ওই মুশরিকদের জন্য চরম এক ধাক্কা। কয়েক মূহুর্তের জন্য তারা নিজেদের চেতনাকে ফিরে পেয়েছিল। তারা তাদের অজ্ঞতা, ভ্রান্তি এবং বোকামিকে অনুধাবন করতে পেরেছিল। সম্প্রদায়ের নেতারা লজ্জা পেল এবং মাথা নিচু করে বলল,

قَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلاَء يَنْطِقُوْنَ

'তুমি তো জানো যে, এরা কথা বলে না'। তিনি বললেন,

قَالَ أَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لاَ يَنفَعُكُمْ شَيْئاً وَّلاَ يَضُرُّكُمْ

'তোমরা কি আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত করো, যা তোমাদের উপকারও করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না।' (আম্বিয়া ২১/৬৫-৬৬)

তিনি আরও বললেন,

قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ، وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

"তোমরা এমন বস্তুর পূজা করো, যা তোমরা নিজ হাতে তৈরি করো? অথচ আল্লাহ তোমাদেরকে ও তোমাদের কর্মসমূহকে সৃষ্টি করেছেন। (ছফফাত ৩৭/৯৫-৯৬)

أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ

'ধিক তোমাদের জন্য এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাদের পূজা করো, ওদের জন্য। তোমরা কি বুঝো না?' (আম্বিয়া ২১/৬৭)।

পূর্বে কয়েক মূহুর্তের জন্য এসব মুশরিকরা নিজেদের চেতনাকে ফিরে পেলেও পরক্ষণেই শয়তান তাদেরকে ওয়াসওয়াসা দেয় এবং তারা তাদের পূর্বের অবস্থায় ফিরে যায়। যিদ ও অহংকারের বশবর্তী হয়ে সম্প্রদায়ের নেতারা ইবরাহীম (আ.)-কে

চূড়ান্ত শাস্তি দেয়ার পরিকল্পনা করল। তারা সিদ্ধান্ত নিল যে, একে আর বাঁচতে দেওয়া যাবে না। শুধু তাই নয়, একে এমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে মারতে হবে, যেন কেউ এর দলে যোগদান করার সাহস না করে। তারা তাঁকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার প্রস্তাব গ্রহণ করল এবং সেটা বাদশাহ নমরূদের কাছে পেশ করল।

ইবরাহীম (আ.) এটাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে তাওহীদের দাওয়াত দেয়ার সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করলেন। নমরূদ ৪০০ বছর ধরে রাজত্ব করায় সে উদ্ধত ও অহংকারী হয়ে উঠেছিল এবং নিজেকে একমাত্র উপাস্য ভেবেছিল। তাই সে ইবরাহীম (আ.)-কে জিজ্ঞেস করল, বলো তোমার উপাস্য কে? নমরূদ ভেবেছিল, ইবরাহীম (আ.) তাকেই উপাস্য বলে স্বীকার করবে। কিন্তু নির্ভীক কণ্ঠে ইবরাহীম (আ.) জবাব দিলেন, رَبِّيَ الَّذِيْ يُحْيِـيْ وَيُمِيْتُ 'আমার পালনকর্তা তিনি, যিনি মানুষকে বাঁচান ও মারেন'। মোটাবুদ্ধির নমরূদ বলল, أَنَا أُحْيِـيْ وَأُمِيْتُ 'আমিও বাঁচাই ও মারি'। অর্থাৎ মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীকে খালাস দিয়ে মানুষকে বাঁচাতে পারি। আবার খালাসের আসামীকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারি। এভাবে সে নিজেকেই মানুষের বাঁচা-মরার মালিক হিসেবে সাব্যস্ত করল। ইবরাহীম (আ'লাইহিস সালাম) তখন দ্বিতীয় যুক্তি পেশ করে বললেন, فَإِنَّ اللهَ يَأْتِيْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ 'আমার আল্লাহ সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদিত করেন, আপনি তাকে পশ্চিম দিক হতে উদিত করুন'। فَبُهِتَ الَّذِيْ كَفَرَ 'অতঃপর কাফির (নমরূদ) এতে হতবুদ্ধি হয়ে পড়লো।' (বাক্বারাহ ২/২৫৮)

যুক্তিতর্কে হেরে গিয়ে নমরূদ ইবরাহীম (আ.)-কে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার হুকুম দিল। অতঃপর তার জন্য বিরাটাকারের আয়োজন শুরু হয়ে গেল। কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা এ সম্পর্কে বলছেন,

قَالُوۡا حَرِّقُوۡهُ وَ انۡصُرُوۡۤا اٰلِهَتَكُمۡ اِنۡ كُنۡتُمۡ فٰعِلِيۡنَ

"তারা বলল, তাকে পুড়িয়ে মার আর তোমাদের উপাস্যদের সাহায্য কর- যদি তোমরা কিছু করতেই চাও।" (আম্বিয়া ২১/৬৮)

তাফসিরে এসেছে, তারা দিনের পর দিন একটি বিশাল গর্ত করে তাতে বড় বড় কাঠের গুড়ি এনে একত্রিত করল এবং সেখানে আগুন ধরিয়ে দিল। আগুন মারাত্মক আকার ধারণ করল। আগুনের শিখা এতটাই উঁচুতে উঠে গেছিলো যে, যদি সেই আগুনের কুন্ডলীর উপর দিয়ে কোন পাখি উড়ে যাওয়ার চেষ্টা করত, তাহলে সেই পাখি

আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যেত এবং তাতে নিক্ষিপ্ত হত। এমনকি সেই আগুনের কুন্ডলীর কাছে যাওয়াও সম্ভব ছিল না। তারা ইবরাহীম (আ.)-কে একটি বড়সড় যন্ত্রের মাধ্যমে সেই ভয়াবহ আগুনে নিক্ষেপ করল। ইবরাহীম (আ.) আগুনের কুন্ডলীর মাঝে গিয়ে পড়লেন।

সহীহ বুখারীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডে নিক্ষিপ্ত হবার সময় ইবরাহীম (আ.) বলে ওঠেন, حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيل، 'আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি কতই না সুন্দর তত্ত্বাবধায়ক।' (বুখারী, হা/৪৫৬৩ তাফসীর অধ্যায়, সূরা আলে-ইমরান।)

যেই সৃষ্টিকর্তা আগুনকে উত্তপ্ত বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন; তিনি কি চাইলেই একই আগুনকে শীতল করে দিতে সক্ষম নন? অবশ্যই সক্ষম! আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তাঁর সৃষ্ট আগুনকে হুকুম দিলেন,

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِيْ بَرْداً وَّسَلاَماً عَلَى إِبْرَاهِيمَ

"হে আগুন! তুমি ইবরাহীমের জন্য শীতল ও প্রশান্তিদায়ক হয়ে যাও।" (আম্বিয়া ২১/৬৯)

অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ইবরাহীম (আ.) ফিরে আসেন এবং এভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কাফিরদের সমস্ত কৌশল বরবাদ করে দেন।

আল্লাহ তাআ'লার সম্মানিত রাসূল ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর উপর দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। জীবন এবং মৃত্যু নিয়ে তাঁর ই'লমান ইয়াক্বিন বা নিশ্চিত জ্ঞান ছিল। তিনি নিশ্চিতভাবেই জানতেন, একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা জীবন দান করেন এবং তিনিই জীবন ফিরিয়ে নেন। কিন্তু তিনি আ'ইনুল ইয়াক্বিন বা স্বচক্ষে দেখার মাধ্যমে তাঁর বিশ্বাসকে আরও উন্নত করতে চেয়েছিলেন। ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার এই ক্ষমতায় কখনোই সন্দেহ করেননি। কারণ নমরূদের সাথে বিতর্কের সময় জীবন-মৃত্যুর যুক্তি তিনিই প্রথম উপস্থাপন করেছিলেন। দূর্বল ঈমান থাকলে তিনি কখনোই যুক্তিতর্ক করতে পারতেন না। কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা এই ঘটনার বর্ণনা দিয়ে বলেছেন,

وَ اِذۡ قَالَ اِبۡرٰهٖمُ رَبِّ اَرِنِیۡ کَیۡفَ تُحۡیِ الۡمَوۡتٰی ؕ قَالَ اَوَ لَمۡ تُؤۡمِنۡ ؕ قَالَ بَلٰی وَ لٰکِنۡ لِّیَطۡمَئِنَّ قَلۡبِیۡ ؕ قَالَ فَخُذۡ اَرۡبَعَۃً مِّنَ الطَّیۡرِ فَصُرۡهُنَّ اِلَیۡکَ ثُمَّ اجۡعَلۡ عَلٰی کُلِّ جَبَلٍ مِّنۡهُنَّ جُزۡءًا ثُمَّ ادۡعُهُنَّ یَاۡتِیۡنَکَ سَعۡیًا ؕ وَ اعۡلَمۡ اَنَّ اللّٰهَ عَزِیۡزٌ حَکِیۡمٌ ۠

"আর যখন ইবরাহীম বলল 'হে, আমার রব, আমাকে দেখান, কিভাবে আপনি মৃতদেরকে জীবিত করেন। তিনি বললেন, তুমি কি বিশ্বাস করনি? সে বলল, অবশ্যই হ্যাঁ, কিন্তু আমার অন্তর যাতে প্রশান্ত হয়। তিনি বললেন, তাহলে তুমি চারটি পাখি নাও। তারপর সেগুলোকে তোমার প্রতি পোষ মানাও। অতঃপর প্রতিটি পাহাড়ে সেগুলোর টুকরো অংশ রেখে আস। তারপর সেগুলোকে ডাক, সেগুলো দৌড়ে আসবে তোমার নিকট। আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (বাক্বারাহ ২/২৬০)

ইবরাহীম (আ.)-কে নির্দেশ দেয়া হলো, পাখিগুলোকে জবাই করে এগুলোর হাড়-মাংস, পাখা ইত্যাদির সবগুলোকেই কিমায় পরিণত করে, সেগুলোকে ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে নিজের পছন্দমত কয়েকটি পাহাড়ে এক-একটি ভাগ রেখে আসতে। ইবরাহীম (আ.) তা-ই করলেন। অতঃপর এদের যখন ডাকলেন, সঙ্গে সঙ্গে হাড়ের সাথে হাড়, পাখার সাথে পাখা, গোশতের সাথে গোশত, রক্তের সাথে রক্ত মিলে পূর্বের রূপ ধারণ করল এবং তার কাছে উড়ে এসে উপস্থিত হলো। [তাফসীরে কুরতুবী: ৪/৩১৪]

ইবরাহীম (আ.) একেবারে তরুণ বয়স থেকে তাওহীদের প্রতি মানুষকে আহবান করতে শুরু করেছেন। তিনি তাঁর পিতা ও তাঁর জাতিকে আল্লাহর দিকে আহবান করেছেন। ইবরাহীম (আ.) এমন একটি বিশেষ পদ্ধতিতে তাঁর জাতির সামনে মূর্তিগুলোর অসারতাকে উপস্থাপন করেছেন যে, কিছু মূহুর্তের জন্য তারা নিজেরাও স্বীকার করে নিয়েছিল যে, প্রকৃতপক্ষে এসব মূর্তি কখনোই তাদের উপকার করতে সক্ষম নয় এবং তাদের তারা তাদের রবও হতে পারেনা। এমনকি ইবরাহীম (আ.) এর আগুন থেকে অলৌকিকভাবে বের হয়ে আসার দৃশ্য দেখার পরও তাঁর জাতির কেউই তাঁর ডাকে সাড়া দেয়নি। তবে শুধুমাত্র একজন ব্যতীত। তিনি হচ্ছেন তাঁর ভাতিজা লূত (আ.)।

ইবরাহীম (আ.) এর জাতি কেউই ঈমান আনলো না। বরং তারা ইবরাহীম (আ.) ও লূত (আ.)-এর উপর অত্যাচার-নির্যাতন করতে শুরু করল। ফলে তারা দেশ ত্যাগ করে হিজরত করতে বাধ্য হলেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কুরআনে বলেন,

فَاٰمَنَ لَهٗ لُوۡطٌ ۘ وَ قَالَ اِنِّیۡ مُهَاجِرٌ اِلٰی رَبِّیۡ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الۡعَزِیۡزُ الۡحَکِیۡمُ ۝

"অতঃপর লূত তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করল। আর ইবরাহীম বলল, আমি আমার রবের দিকে হিজরত করছি। নিশ্চয় তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (আনকাবূত ২৯/২৬)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার নির্দেশে ইবরাহীম (আ.) স্ত্রী সারাহ ও ভাতিজা লূত (আ.)-কে নিয়ে শাম বা ফিলিস্তিনের কেন'আনে হিজরত করলেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন,

وَ نَجَّیۡنٰهُ وَ لُوۡطًا اِلَی الۡاَرۡضِ الَّتِیۡ بٰرَکۡنَا فِیۡهَا لِلۡعٰلَمِیۡنَ ۝

"আর আমি তাকে ও লূতকে উদ্ধার করে সে দেশে নিয়ে গেলাম, যেখানে আমি বিশ্ববাসীর জন্য বরকত রেখেছি।" (আম্বিয়া ২১/৭১)

হিজরতের সময় ইবরাহীম (আ.) হাররান নামক স্থান অতিক্রম করছিলেন। হাররানের লোকেরা নক্ষত্রের পূজা করত। তাদের এই ধর্মে সুনির্দিষ্ট কোনো নিয়মনীতি মূলত তারা বিভিন্ন কুসংস্কারে বিশ্বাস করত এবং নিজেদের খেয়াল - খুশির মতো বিভিন্ন নক্ষত্রের পূজা করত। কেউ কেউ সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্রের পূজা করত, কেউ আবার অন্য আরেকটির পূজা করত। ইবরাহীম (আ.) এই জাতির কাছে তাওহীদকে উপস্থাপন করলেন। ইবরাহীম (আ.) কৌশলে নিজ জাতির সামনে তাদের মূর্তির অসারতা যেমনভাবে তুলে ধরেছিলেন, তেমনই ভিন্ন এক কৌশলে এই হাররন এর লোকদের কাছেও তিনি তাওহীদকে উপস্থাপন করেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা ইবরাহীম (আ.)-এর দাওয়াতের অসাধারণ এই কৌশলকে কুরআনে উল্লেখ করেছেন,

فَلَمَّا جَنَّ عَلَیۡهِ الَّیۡلُ رَاٰ کَوۡکَبًا ۚ قَالَ هٰذَا رَبِّیۡ ۚ فَلَمَّاۤ اَفَلَ قَالَ لَاۤ اُحِبُّ الۡاٰفِلِیۡنَ- فَلَمَّا رَاَ الۡقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّیۡ ۚ فَلَمَّاۤ اَفَلَ قَالَ لَئِنۡ لَّمۡ یَهۡدِنِیۡ رَبِّیۡ لَاَکُوۡنَنَّ مِنَ الۡقَوۡمِ الضَّآلِّیۡنَ- فَلَمَّا رَاَ الشَّمۡسَ بَازِغَۃً قَالَ هٰذَا رَبِّیۡ هٰذَاۤ اَکۡبَرُ ۚ فَلَمَّاۤ اَفَلَتۡ قَالَ یٰقَوۡمِ اِنِّیۡ بَرِیۡٓءٌ مِّمَّا تُشۡرِکُوۡنَ- اِنِّیۡ وَجَّهۡتُ وَجۡهِیَ لِلَّذِیۡ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ حَنِیۡفًا وَّ مَاۤ اَنَا مِنَ الۡمُشۡرِکِیۡنَ

"রাতের আঁধার যখন তাকে আচ্ছন্ন করল তখন সে নক্ষত্র দেখতে পেল, (তখন) বলল, এটাই হচ্ছে আমার প্রতিপালক। কিন্তু যখন তা অস্তমিত হল, সে বলল, যা অস্তমিত হয়ে যায় তার প্রতি আমার কোন অনুরাগ নেই। অতঃপর যখন সে চাঁদ উজ্জ্বলরূপে উদীয়মান দেখল, বলল, 'এ আমার রব'। পরে যখন তা ডুবে গেল, বলল, 'যদি আমার রব আমাকে হিদায়াত না করেন, নিশ্চয় আমি পথহারা কওমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব'। অতঃপর যখন সে সূর্য উজ্জ্বলরূপে উদীয়মান দেখল, বলল, 'এ আমার রব, এ সবচেয়ে বড়'। পরে যখন তা ডুবে গেল, তখন সে বলল, 'হে আমার কওম, তোমরা যা শরীক কর, নিশ্চয় আমি তা থেকে মুক্ত'। নিশ্চয় আমি নিবিষ্ট করেছি আমার চেহারা একনিষ্ঠভাবে তাঁর জন্য, যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।" (আন'আম ৬/৭৬-৭৯)

উপরের বর্ণনা ভঙ্গিতে মনে হয় যেন ইবরাহীম (আ.) ঐ দিনই প্রথম নক্ষত্র, চন্দ্র ও সূর্য দেখলেন এবং 'এটি আমার পালনকর্তা' বলে সাময়িকভাবে মুশরিক হয়েছিলেন। পরে শিরক পরিত্যাগ করে মুসলিম হলেন। অথচ ঘটনা মোটেই তা নয়। কেননা ঐ সময় ইবরাহীম (আ.) সত্তরোর্ধ্ব বয়সের একজন নবী। আর নবীগণ জন্ম থেকেই নিষ্পাপ ও শিরকমুক্ত থাকেন। আসল কথা হলো এই যে, মূর্তি পূজার অসারতা বুঝানো যতটা সহজ ছিল, তারকা পূজার অসারতা বুঝানো ততটা সহজ ছিল না। কেননা ওটা মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে। তাই ইবরাহীম (আ.) এখানে বৈজ্ঞানিক পন্থা বেছে নিলেন এবং জনগণের সহজবোধ্য এমন একটি প্রমাণ উপস্থাপন করলেন, যাতে তাদের লা-জওয়াব হওয়া ব্যতীত কোন উপায় ছিল না। তিনি সৌরজগতের গতি-প্রকৃতি যে আল্লাহর হুকুমের অধীন, সে কথা না বলে তাদের অস্তমিত হওয়ার বিষয়টিকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন। কারণ এটাই ছিল তাদের জন্যে সহজবোধ্য। তিনি বলেন, যা ক্ষয়ে যায়, ডুবে যায়, হারিয়ে যায়, নিজেকে টিকিয়ে রাখতে পারে না, বরং দৈনিক ওঠে আর ডোবে, সে কখনো মানুষের প্রতিপালক হতে পারে না। বরং সর্বোচ্চ পালনকর্তা কেবল তিনিই হতে পারেন, যিনি এসব কিছুর সৃষ্টিকর্তা ও বিধানদাতা। আর তিনিই হলেন 'আল্লাহ'। আমি তাঁর দিকেই ফিরে গেলাম এবং বাপ-দাদার আমল থেকে তোমরা যে শিরক করে আসছো, আমি তা থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করলাম।

বলা বাহুল্য, এর অন্তর্নিহিত দাওয়াত ছিল এই যে, হে আমার জাতি! তোমরাও আমার মতো আল্লাহর দিকে ফিরে এসো এবং শিরক হতে মুক্ত হও। কিন্তু তাঁর এই তর্কযুদ্ধ নিষ্ফল হলো। সম্প্রদায়ের নেতারা নিজ নিজ মতের উপরে দৃঢ় রইল। কেউ তাঁর আহবানে সাড়া দিল না।

ইবরাহীম (আ.) দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে অবিরাম মানুষের সাথে ইসলাম নিয়ে বাদানুবাদ করেছেন, যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা এই বিষয়টি সম্পর্কে বলছেন,

وَ حَاۤجَّهٗ قَوۡمُهٗ ؕ قَالَ اَتُحَآجُّوۡٓنِّیۡ فِی اللّٰهِ وَ قَدۡ هَدٰىنِ ؕ وَ لَاۤ اَخَافُ مَا تُشۡرِكُوۡنَ بِهٖۤ اِلَّاۤ اَنۡ یَّشَآءَ رَبِّیۡ شَیۡـًٔا ؕ وَسِعَ رَبِّیۡ كُلَّ شَیۡءٍ عِلۡمًا ؕ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوۡنَ- وَ كَیۡفَ اَخَافُ مَاۤ اَشۡرَكۡتُمۡ وَ لَا تَخَافُوۡنَ اَنَّكُمۡ اَشۡرَكۡتُمۡ بِاللّٰهِ مَا لَمۡ یُنَزِّلۡ بِهٖ عَلَیۡكُمۡ سُلۡطٰنًا ؕ فَاَیُّ الۡفَرِیۡقَیۡنِ اَحَقُّ بِالۡاَمۡنِ ۚ اِنۡ كُنۡتُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ ۘ

"আর তার কওম তার সাথে বাদানুবাদ করল। সে বলল, তোমরা কি বাদানুবাদ করছো আমার সাথে আল্লাহর ব্যাপারে, অথচ তিনি আমাকে হিদায়াত দিয়েছেন? তোমরা তাঁর সাথে যা শরীক কর, আমি তাকে ভয় করি না, তবে আমার রব যদি কিছু করতে চান। আমার রব ইলম দ্বারা সব কিছু পরিব্যাপ্ত করে আছেন। অতঃপর তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না? তোমরা যা শরীক করেছ কীভাবে আমি তাকে ভয় করব? অথচ তোমরা ভয় করছো না যে, তোমরা শরীক করেছো আল্লাহর সাথে এমন কিছু, যার পক্ষে তিনি তোমাদের উপর কোন প্রমাণ নাযিল করেননি। অতএব কোন দল নিরাপত্তার বেশি হকদার, যদি তোমরা জেনে থাকো?" (আন'আম ৬/৮০-৮১)

ইবরাহীম (আ.) তাঁর গোটা জাতির বিরুদ্ধে একা বাদানুবাদ করে চলেছেন। এটা মোটেই সহজ কোনো বিষয় নয়। এরপরও তিনি স্পষ্টভাবে তাঁর জাতির লোকদের জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করেন না, কাউকে পরোয়া করেন না। সম্পূর্ণ এক জাতির বিরুদ্ধে একা থেকেও তিনি নিজেকে নিরাপদ মনে করছিলেন, কারণ তিনি ভালোভাবেই জানতেন আল্লাহ তাঁর সাথেই আছেন আর আল্লাহ সাথে থাকলে অন্য কাউকে প্রয়োজন হয়না। ইবরাহীম (আ.) এর বক্তব্যের সমর্থনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেছেন,

اَلَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَ لَمۡ یَلۡبِسُوۡۤا اِیۡمَانَهُمۡ بِظُلۡمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الۡاَمۡنُ وَ هُمۡ مُّهۡتَدُوۡنَ ۘ

"যারা ঈমান এনেছে এবং নিজ ঈমানকে যুলমের সাথে সংমিশ্রণ করেনি, তাদের জন্যই নিরাপত্তা এবং তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।" (আন'আম ৬/৮২)

ইবরাহীম (আ.) তাঁর জীবনে অসংখ্য বার হিজরত করেছেন। প্রথমবার তিনি ব্যাবিলন থেকে শামের কেন'আনে হিজরত করেন এবং দ্বিতীয় বার দুর্ভিক্ষ তাড়িত কেন'আন থেকে অন্যান্যদের ন্যায় মিসরে রওয়ানা হলেন।
ঐ সময় মিসরের রাজা ছিল একজন নারী লোলুপ মদ্যপ শাসক। তার নিয়োজিত লোকেরা রাস্তার পথিকদের মধ্যে কোনো সুন্দরী মহিলা পেলেই তাকে ধরে নিয়ে বাদশাহকে পৌঁছে দিত। যদিও বিবি 'সারা' ঐ সময় ছিলেন বৃদ্ধা মহিলা, তথাপি তিনি ছিলেন সৌন্দর্য্যের রাণী। মিসরীয় সম্রাটের নিয়ম ছিল এই যে, যে মহিলাকে তারা অপহরণ করত, তার সাথী পুরুষ লোকটি যদি স্বামী হত, তাহলে তাকে হত্যা করে মহিলাকে নিয়ে যেত। আর যদি ভাই বা পিতা হত, তাহলে তাকে ছেড়ে দিত। তারা ইবরাহীমকে জিজ্ঞেস করলে, তিনি সারাকে তাঁর 'বোন' পরিচয় দিলেন। এটি মূলত মিথ্যা ছিল না। বরং তিনি যেই শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন তার একাধিক অর্থ হতে পারে। নিঃসন্দেহে সারা তাঁর দ্বীনি বোন ছিলেন। ইবরাহীম (আ.) তাকে আল্লাহর জিম্মায় ছেড়ে দিয়ে স্বলাতে দাঁড়িয়ে গেলেন ও আল্লাহর নিকটে স্বীয় স্ত্রীর ইজ্জত হিফাযতের জন্য আকুলভাবে প্রার্থনা করতে থাকলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ নিশ্চয়ই তার স্ত্রীর ইজ্জতের হিফাযত করবেন।

সারাকে যথারীতি ফিরাউনের কাছে আনা হলো। অতঃপর পরবর্তী ঘটনা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,
'যখন সারা সম্রাটের নিকটে নীত হলেন এবং সম্রাট তার দিকে এগিয়ে এলো, তখন তিনি ওযু করার জন্য গেলেন ও স্বলাতে রত হয়ে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে বললেন, হে আল্লাহ! যদি তুমি জেনে থাকো যে, আমি তোমার উপরে ও তোমার রাসূলের উপরে ঈমান এনেছি এবং আমি আমার একমাত্র স্বামীর জন্য সতীত্ব বজায় রেখেছি, তাহলে তুমি আমার উপরে এই কাফিরকে বিজয়ী করো না।' (বুখারী হা/২২১৭ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়; আহমাদ, সনদ সহীহ।)

সতীসাধ্বী স্ত্রী সারার দু'আ সঙ্গে সঙ্গে কবুল হয়ে গেল। সম্রাট এগিয়ে আসার উপক্রম করতেই হাত-পা অবশ হয়ে পড়ে গিয়ে গোঙাতে লাগলো। তখন সারাহ দু'আ করে বললেন, হে আল্লাহ! লোকটি যদি এভাবে মারা যায়, তাহলে লোকেরা ভাববে আমি ওকে হত্যা করেছি'। তখন আল্লাহ সম্রাটকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন। কিন্তু শয়তান আবার এগিয়ে যেতে চাইল। তবে আবারও ব্যর্থ হয়ে মরার মত পড়ে রইল।

এভাবে সে দুই অথবা তিনবার বেহুঁশ হয়ে পড়লো আর সারা-র দু'আয় হুঁশ ফিরে পেল। অবশেষে সে বুঝতে পারলো যে, সারা কোনো সাধারণ নারী নয়। সুতরাং মিসরের রাজা ভীত হয়ে সারা-কে ছেড়ে দিল। শুধু তাই-ই নয়, সারাহ-কে সে ডাইনি মনে করার কারণে তাঁর সাথে খিদমতের জন্য হাজেরাকে পাঠিয়ে দিল। অতঃপর সারাহ তাঁর খাদিমা হাজেরাকে নিয়ে সসম্মানে স্বামী ইবরাহীম (আ.)-এর কাছে ফিরে এলেন।

ইবরাহীম (আ.) যথারীতি মিসর থেকে কেন'আনে ফিরে এলেন। বন্ধ্যা স্ত্রী সারাহ তাঁর খাদেমা হাজেরাকে প্রাণপ্রিয় স্বামী ইবরাহীমকে উৎসর্গ করলেন। ইবরাহীম (আ.) তাঁকে স্ত্রীত্বে বরণ করে নিলেন। পরে দ্বিতীয়া স্ত্রী হাজেরার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন তার প্রথম সন্তান ইসমাঈল (আ.)। এই সময় ইবরাহীমের বয়স ছিল অন্যূন ৮৬ বছর। নিঃসন্তান পরিবারে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। শুষ্ক মরুতে যেন প্রাণের জোয়ার এলো। বস্তুত ইসমাঈল ছিলেন নিঃসন্তান ইবরাহীমের দু'আর ফসল। কেননা তিনি বৃদ্ধ বয়সে আল্লাহর নিকটে 'নেককার সন্তান' কামনা করেছিলেন। যেমন আল্লাহ বলেন, رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِيْنَ، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلاَمٍ حَلِيْمٍ - '(ইবরাহীম বললেন,) হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি সৎকর্মশীল সন্তান দাও। অতঃপর আমরা তাকে একটি ধৈর্যশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।' (ছ্বফফাত ৩৭/১০০-১০১)।

ইসমাঈল এবং হাজেরা (আ.)-কে নিয়ে ইবরাহীম (আ'লাইহিস সালাম) এর এক নতুন পরীক্ষার সূচনা হলো।

হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর পক্ষ থেকে শিশু পুত্র ইসমাঈল ও তাঁর মাকে মক্কায় নির্বাসনে রেখে আসার নির্দেশ পেলেন। তখনই তার অন্তরে বিশ্বাস জন্মেছিল যে,

নিশ্চয়ই এ নির্দেশের মধ্যে আল্লাহর কোন মহতী পরিকল্পনা লুকায়িত আছে এবং নিশ্চয়ই তিনি ইসমাঈল (আ.) ও তাঁর মাকে ধ্বংস করবেন না।

অতঃপর এক থলে খেজুর ও এক মশক পানি সহ তাদের বিজনভূমিতে রেখে যখন ইবরাহীম (আ.) একাকী ফিরে আসতে থাকেন, তখন বেদনা-বিস্মিত স্ত্রী হাজেরা ব্যাকুলভাবে তার পিছে পিছে আসতে লাগলেন আর স্বামীকে এর কারণ জিজ্ঞেস করতে থাকেন। কিন্তু বুকে বেদনার পাষাণ বাঁধা ইবরাহীম (আ.)-এর মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরুলো না। তখন হাজেরা বললেন, আপনি কি আল্লাহর হুকুমে আমাদেরকে এভাবে ফেলে যাচ্ছেন? ইবরাহীম ইশারায় বললেন, হ্যাঁ। তখন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে অটল বিশ্বাস ও দৃঢ় মনোবল নিয়ে হাজেরা বলে উঠলেন, إِذَنْ لايُضَيِّعُنَا الله ‘তাহলে আল্লাহ আমাদের ধ্বংস করবেন না’। ফিরে এলেন তিনি সন্তানের কাছে। দু’একদিনের মধ্যেই ফুরিয়ে যাবে পানি ও খেজুর। কি হবে উপায়? খাদ্য ও পানি বিহনে বুকের দুধ শুকিয়ে গেলে কচি বাচ্চা কি খেয়ে বাঁচবে? পাগলপ্রায় হয়ে তিনি মানুষের সন্ধানে দৌঁড়াতে থাকেন সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের এ মাথা আর ও মাথায়। এভাবে সপ্তমবারে তিনি দূর থেকে দেখেন যে, বাচ্চার পায়ের কাছ থেকে মাটির বুক চিরে বেরিয়ে আসছে ঝর্ণার ফল্গুধারা, জিবরীলের পায়ের গোড়ালি বা তার পাখার আঘাতে যা সৃষ্টি হয়েছিল। হাজেরা ছুটে এসে বাচ্চাকে কোলে নিলেন অসীম মমতায়। স্নিগ্ধ পানি পান করে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। হঠাৎ অদূরে একটি আওয়াজ শুনে তিনি চমকে উঠলেন। উনি জিবরীল (আ.)। বলে উঠলেন, لا تخافوا الضَّيعةَ، إنَّ هذا بيتُ الله يَبْنى هذا الغلامُ و أبوه وإن الله لايُضيعُ أهلَه- ‘আপনারা ভয় পাবেন না। এখানেই আল্লাহর ঘর। এই সন্তান ও তার পিতা এ ঘর সত্বর পুনঃনির্মাণ করবেন। আল্লাহ তাঁর ঘরের বাসিন্দাদের ধ্বংস করবেন না’। এই বলেই শব্দ মিলিয়ে গেল।

অতঃপর শুরু হলো ইসমাঈলী জীবনের নব অধ্যায়। পানি দেখে পাখি আসলো। পাখি ওড়া দেখে ব্যবসায়ী কাফেলা আসলো। তারা এসে পানির মালিক হিসেবে হাজেরার নিকটে অনুমতি চাইলে তিনি এই শর্তে মনযুর করলেন যে, আপনাদের এখানে বসতি স্থাপন করতে হবে। বিনা পয়সায় এই প্রস্তাব তারা সাগ্রহে কবুল করল। এরাই হলো ইয়ামেন থেকে আগত বনু জুরহুম গোত্র। বড় হয়ে ইসমাঈল এই গোত্রে বিয়ে করেন।

এঁরাই কা'বা গৃহের খাদিম হন এবং এদের শাখা গোত্র কুরাইশ বংশে শেষনবী মুহাম্মাদ ﷺ এর আগমন ঘটে।

একমাত্র শিশু পুত্র ইসমাঈল (আ.) ও তাঁর মাকে মক্কায় রেখে এলেও ইবরাহীম (আ.) মাঝে-মধ্যে সেখানে যেতেন ও দেখা-শুনা করতেন। এভাবে ইসমাঈল যখন বৃদ্ধ পিতার সহযোগী হতে চলেছেন এবং পিতৃহৃদয় পুরোপুরি জুড়ে বসেছেন, ঠিক সেই সময় আল্লাহ ইবরাহীমের মুহাব্বাতের কুরবানী কামনা করলেন।

একদিন ইবরাহীম (আ.) স্বপ্নে দেখলেন তিনি তাঁর প্রাণপ্রিয় পুত্র ইসমাঈল (আ.)-কে কুরবানী করছেন। এভাবে পরপর তিন্দিন তিনি একই স্বপ্ন দেখলেন। যেহেতু নবীদের স্বপ্ন নিছক কোনো স্বপ্ন হয়না, বরং তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই বার্তা হয়, তাই ইবরাহীম (আ.) এই বিষয়ে সরাসরি পুত্রের সাথে আলোচনা করলেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা এই সম্পর্কে কুরআনে বলেছেন,

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ

"যখন (ইসমাঈল) পিতার সাথে চলাফেরা করার মত বয়সে উপনীত হলো, তখন (ইবরাহীম) তাকে বললেন, হে আমার বেটা! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে যবহ করছি। এখন বলো তোমার অভিমত কি? সে বলল, হে পিতা! আপনাকে যা নির্দেশ করা হয়েছে, আপনি তা কার্যকর করুন। আল্লাহ চাহেন তো আপনি আমাকে ধৈর্য্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত দেখতে পাবেন।" (ছ্বফফাত ৩৭/১০২)

পিতা পুত্রকে তাঁর স্বপ্নের কথা বর্ণনা করে পুত্রের অভিমত চাইলেন। পুত্র তার অভিমত ব্যক্ত করার সময় বললেন, 'ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে সবরকারীদের অন্তর্ভুক্ত দেখতে পাবেন'। ইনশাআল্লাহ না বললে হয়ত তিনি ধৈর্য্য ধারণের তাওফীক পেতেন না।

সাইয়্যিদিনা ইবরাহীম (আ.) ইসমাঈল (আ.)-কে কুরবানী করতে শুরু করলেন। আল্লাহ তাআ'লার কাছে পিতা-পুত্রের এই কুরবানীর বিষয়টি এত পছন্দ হলো যে, তিনি জিবরীল (আ.) এর মাধ্যমে জান্নাত থেকে একটি বকরি পাঠিয়ে দিলেন এবং তা ইসমাঈল (আ'লাইহিস সালাম) এর পরিবর্তে কুরবানী হয়ে গেল। এজন্য তাকে যবীহুল্লাহ বলা হয়।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন,

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَ تَلَّهُ لِلْجَبِينِ، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَّآ إِبْرَاهِيْمُ، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلاَءُ الْمُبِيْنُ، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِيْنَ، سَلاَمٌ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ

"অতঃপর (পিতা-পুত্র) উভয়ে যখন আত্মসমর্পণ করল এবং পিতা পুত্রকে উপুড় করে শায়িত করল। তখন আমরা তাকে ডাক দিয়ে বললাম, হে ইবরাহীম! তুমি তোমার স্বপ্ন সত্যে পরিণত করেছো। আমরা এভাবেই সৎকর্মশীলগণের প্রতিদান দিয়ে থাকি। নিশ্চয়ই এটি একটি সুস্পষ্ট পরীক্ষা। আর আমরা তার পরিবর্তে একটি মহান যবহ প্রদান করলাম এবং আমরা এ বিষয়টি পরবর্তীদের মধ্যে রেখে দিলাম। ইবরাহীমের উপর শান্তি বর্ষিত হৌক।" (ছ্বফফাত ৩৭/১০৩-১০৯)

এই ঘটনা থেলে আমাদের জন্য একটি বড় শিক্ষা হলো, আল্লাহর মুহাব্বাত ও দুনিয়াবী কোনো মুহাব্বাত একত্রিত হলে সর্বদা আল্লাহর মুহাব্বাতকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং দুনিয়াবী মুহাব্বাতকে কুরবানী দিতে হবে।

নূহ (আ.) তূফানের সময় বায়তুল্লাহর প্রাচীর বিনষ্ট হলেও ভিত্তি আগের মতোই থেকে যায়। পরবর্তীতে আল্লাহর হুকুমে একই ভিত্তিভূমিতে ইবরাহীম (আ.) তা পুনঃনির্মাণ করেন। এই নির্মাণকালে ইবরাহীম (আ.) কেন‘আন থেকে মক্কায় এসে বসবাস শুরু করেন এবং আল্লাহর নির্দেশে পিতা-পুত্র মিলে কা'বা ঘরের নির্মাণ কাজ শুরু করেন। ইসমাঈল (আ.) পাথর নিয়ে আসতেন এবং ইবরাহীম (আ.) ঘর নির্মাণ করতেন। এভাবে নির্মাণ করতে করতে যখন দেয়াল উঁচু হয়ে গেল তখন কাজ করার জন্য ইবরাহীম (আ.) বিখ্যাত মাকামে ইবরাহীম নামক পাথরটি নিয়ে আসলেন এবং তাঁর জন্য যথাযথ স্থানে রাখলেন। তিনি সেই পাথরের উপর দাঁড়িয়ে বাকি নির্মাণ কাজ করতে থাকলেন।

অতঃপর কা‘বা গৃহ নির্মাণ শেষে পিতা-পুত্র মিলে যে প্রার্থনা করেন, তা যেমন ছিল অন্তরভেদী, তেমনি ছিল সুদূরপ্রসারী ফলদায়ক। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيْلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ- رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ- رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ

"স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কা‘বা গৃহের ভিত নির্মাণ করল এবং দু‘আ করল- ‘হে আমাদের রব! তুমি আমাদের (এই খিদমত) কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। হে প্রভু! তুমি আমাদের উভয়কে তোমার আজ্ঞাবহে পরিণত কর এবং আমাদের বংশধরগণের মধ্য থেকেও তোমার প্রতি একটা অনুগত দল সৃষ্টি কর। তুমি আমাদেরকে হজ্জের নীতি-নিয়ম শিখিয়ে দাও এবং আমাদের তওবা কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি তওবা কবুলকারী ও দয়াবান। হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি এদের মধ্য থেকেই এদের নিকটে একজন রাসূল প্রেরণ কর, যিনি তাদের নিকটে এসে তোমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনাবেন, তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবেন এবং তাদের পবিত্র করবেন। নিশ্চয়ই তুমি পরাক্রমশালী ও দূরদৃষ্টিময়।" (বাক্বারাহ ২/১২৭-১২৯)

ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ'লাইহিমাস সালাম) এর উপরোক্ত দু‘আ আল্লাহ কবুল করেছিলেন। যার ফলশ্রুতিতে তাদের বংশে চিরকাল একদল মুত্তাকী পরহেযগার মানুষের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। তাঁদের পরের সকল নবী তাঁদের বংশধর ছিলেন। কা‘বার খাদিম হিসেবেও চিরকাল তাদের বংশের একদল দ্বীনদার লোক সর্বদা নিয়োজিত ছিল। ইবরাহীম (আ.)-এর দু‘আর ফসল হিসেবেই মক্কায় আগমন করেন বিশ্বনবী ও শেষনবী মুহাম্মাদ ﷺ । তিনি বলতেন, أَنَا دَعْوَةُ أَبِيْ إِبْرَاهِيْمَ وَبُشْرَى عِيْسَى- ‘আমি আমার পিতা ইবরাহীমের দু‘আর ফসল ও ঈসার সুসংবাদ’। (আহমাদ ও ছহীহ ইবনে হিববান, সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৫৪৫)

লূত (আ'লাইহিস সালাম)

লূত (আ.) বসবাস করতেন ইরাকের ব্যাবিলন শহরে। পরবর্তীতে তিনি ইবরাহীম (আ.) এর সাথে হিজরত করে ফিলিস্তিনের দিকে চলে আসেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা সাইয়্যিদিনা লূত (আ.)-কে সাদূম জাতির নিকট প্রেরণ করেছিলেন। তারা বসবাস করত বর্তমান ফিলিস্তিন এবং জর্ডানের মধ্যবর্তী অঞ্চলে।

লূত (আ.)-এর কওম আল্লাহর ইবাদত ছেড়ে শিরক ও কুফরীতে লিপ্ত হয়েছিল। দুনিয়াবি উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত হওয়ার কারণে তারা সীমালঙ্ঘনকারী জাতিতে

পরিণত হয়েছিল। পূর্বেকার ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলির ন্যায় তারা চূড়ান্ত বিলাস-ব্যসনে গা ভাসিয়ে দিয়েছিল। অন্যায়-অনাচার ও নানাবিধ দুষ্কর্ম তাদের মজ্জাগত অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। এমনকি পুংমৈথুন বা সমকামিতার মতো নোংরামিতে তারা লিপ্ত হয়েছিল, যা ইতিপূর্বে কোন জাতির মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়নি। জন্তু-জানোয়ারের চেয়ে নিকৃষ্ট ও হঠকারী এই কওমের হিদায়াতের জন্য আল্লাহ লূত (আ.)-কে প্রেরণ করলেন। কুরআনে লূত (আ.)-কে 'তাদের ভাই' (শু'আরা ২৬/১৬১) বলা হলেও তিনি ছিলেন সেখানে মুহাজির। নবী ও উম্মতের সম্পর্কের কারণে তাঁকে 'তাদের ভাই' বলা হয়েছে। তিনি এসে পূর্বেকার নবীগণের ন্যায় প্রথমে তাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিয়ে বললেন,

إِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ أَمِيْنٌ، فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيْعُوْنِ، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

'আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত রাসূল। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি এর জন্য তোমাদের নিকটে কোনোরূপ প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্বপ্রভু আল্লাহ দিবেন।' (শু'আরা ২৬/১৬২-১৬৫) অতঃপর তিনি তাদের বদভ্যাসের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, أَتَأْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِيْنَ- 'বিশ্ববাসীর মধ্যে কেন তোমরাই কেবল পুরুষদের নিকটে (কুকর্মের উদ্দেশ্যে- আ'রাফ ৭/৮১) এসে থাকো? আর তোমাদের স্ত্রীগণকে বর্জন কর, যাদেরকে তোমাদের জন্য তোমাদের পালনকর্তা সৃষ্টি করেছেন? নিঃসন্দেহে তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।' (শু'আরা ২৬/১৬৫-১৬৬)

জবাবে কওমের নেতারা বলল,

لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَا لُوْطُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ، قَالَ إِنِّيْ لِعَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِيْنَ

'হে লূত! যদি তুমি (এসব কথাবার্তা থেকে) বিরত না হও, তাহলে তুমি অবশ্যই বহিষ্কৃত হবে। তিনি বললেন, আমি তোমাদের এইসব কাজকে ঘৃণা করি (শু'আরা ২৬/১৬৭-১৬৮)। তিনি তাদের তিনটি প্রধান নোংরামির কথা উল্লেখ করে বলেন,

وَلُوْطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُوْنَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُوْنَ السَّبِيْلَ وَتَأْتُوْنَ فِيْ نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ، قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ

'তোমরা এমন অশ্লীল কাজ করছো, যা তোমাদের পূর্বে পৃথিবীর কেউ কখনো করেনি। তোমরা কি পুংমৈথুনে লিপ্ত আছো, রাহাজানি করছ এবং নিজেদের মজলিসে প্রকাশ্যে

গর্হিত কর্ম করছো। জবাবে তাঁর সম্প্রদায় কেবল এ কথা বলল যে, আমাদের উপরে আল্লাহর গযব নিয়ে এসো, যদি তুমি সত্যবাদী হও। তিনি তখন বললেন, হে আমার পালনকর্তা! এই দুষ্কৃতিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তুমি আমাকে সাহায্য কর। (আনকাবূত ২৯/২৮-৩০; আ'রাফ ৭/৮০)

সাদূমবাসীদের জন্য আল্লাহ স্বীয় নেয়ামত সমূহের দুয়ার খুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা তার শুকরিয়া আদায় না করে কুফরী করে এবং নেশায় মত্ত হয়ে বিলাস-ব্যসন, কাম-প্রবৃত্তি ও লোভ-লালসার জালে এমনভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়ে যে, লজ্জা-শরম ও ভালো-মন্দের স্বভাবজাত পার্থক্যবোধটুকুও তারা হারিয়ে ফেলে। তারা এমন প্রকৃতি বিরুদ্ধ নির্লজ্জ কাজে লিপ্ত হয়, যা হারাম ও কবীরা গোনাহ তো বটেই, কুকুর-শূকরের মতো নিকৃষ্ট জন্তু-জানোয়ারও এর নিকটবর্তী হয় না। তারা এমন বদ্ধ নেশায় মত্ত হয় যে, লূত (আ.)-এর উপদেশবাণী ও আল্লাহর গযবের ভীতি প্রদর্শন তাদের হৃদয়ে কোনো রেখাপাত করেনি। উল্টা তারা তাদের নবীকেই শহর থেকে বের করে দেবার হুমকি দেয় এবং বলে যে, 'তোমার প্রতিশ্রুত আযাব এনে দেখাও, যদি তুমি সত্যবাদী হও।'(আনকাবূত ২৯/২৯)

তখন লূত (আ.) বিফল মনোরথ হয়ে আল্লাহর সাহায্য কামনা করলেন। ফলে যথারীতি গযব নেমে এলো।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

ملعونٌ منْ عَمِلَ عَمَلَ قومِ لوط

অভিশপ্ত ঐ ব্যক্তি, যে লূতের কওমের মত কুকর্ম করে। (রাযীন, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৩৫৮৩।)

অন্যত্র তিনি বলেন, لاينظرُ اللهُ عزَّ وجلَّ إلى رجلٍ أتى رجُلاً أو امرأةً فى دُبرها আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির প্রতি ফিরে তাকাবেন না, যে ব্যক্তি কোন পুরুষ বা নারীর মলদ্বারে মৈথুন করে'। (তিরমিযী, মিশকাত হা/৩৫৮৫।)

একদিন আল্লাহর হুকুমে কয়েকজন ফেরেশতা মানুষের রূপ ধারণ করে প্রথমে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বাড়িতে পদার্পণ করলেন। তিনি তাদেরকে মেহমানদারীর জন্য একটা আস্ত বাছুর যবেহ করে ভুনা করে তাদের সামনে পরিবেশন করলেন। কিন্তু তারা তাতে হাত দিলেন না। এতে ইবরাহীম (আ.) ভয় পেয়ে গেলেন (হূদ ১১/৬৯-

৭০)। কেননা এটা ঐ সময়কার দস্যু-ডাকাতদেরই স্বভাব ছিল যে, তারা যে বাড়িতে ডাকাতি করত বা যাকে খুন করতে চাইত, তার বাড়িতে খেত না। ফেরেশতাগণ নবীকে অভয় দিয়ে নিজেদের পরিচয় দিয়ে বললেন, ‘আমরা এসেছি অমুক শহরগুলি ধ্বংস করে দিতে। ইবরাহীম (আ.) একথা শুনে তাদের সাথে তর্ক জুড়ে দিলেন (হূদ ১১/৭৪) এবং বললেন, সেখানে যে লূত আছে। তারা বললেন, সেখানে কারা আছে, আমরা তা ভালোভাবেই জানি। আমরা অবশ্যই তাকে ও তার পরিবারকে রক্ষা করব, তবে তাঁর স্ত্রী ব্যতীত। সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।’(আনকাবূত ২৯/৩১-৩২)
অতঃপর তারা ইবরাহীম দম্পতিকে ইসহাক-এর জন্মের সুসংবাদ শোনালেন। বিবি সারা ছিলেন নিঃসন্তান। অতি বৃদ্ধ বয়সে এই সময় তাঁকে হযরত ইসহাকের জন্মের সুসংবাদ দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, ইসহাকের পরে তার ঔরসে যে ইয়াকূবের জন্ম হবে সেটাও জানিয়ে দেওয়া হলো (হূদ ১১/৭১-৭২)।

এরপর ফেরেশতা গেলেন লূত (আ.) এর কাছে। কওমে লূত সমকামিতার মতো বিকৃত রুচির কাজে এতোটাই পাগলপারা ছিল যে, এই গর্হিত কাজের কোনো সময়,স্থান, কাল, ব্যক্তি, পরিচয় ছিল না। যখন যাকে পেত তার সঙ্গেই তারা এই বিকৃতরুচির কাজ করতো। তারা যখন জানতে পারলো যে, লূত-এর বাড়িতে অতীব সুদর্শন কয়েকজন নওজোয়ান এসেছে, তখন তারা খুশিতে আত্মহারা হয়ে সেদিকে ছুটে এলো। (হূদ ১১/৭৮)

লূত (আ.) বললেন, এরা আমার মেহমান, আমাকে লাঞ্ছিত করো না। মেহমানের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো, আমাকে দুঃখিত করো না। তারা বললো, আমরা কি আপনাকে দুনিয়াবাসীর সমর্থন করতে নিষেধ করিনি? তিনি উত্তরে বললেন, যদি তোমরা কিছু করতেই চাও, তবে বৈধ উপায়ে মেয়েদের সাথে করো। আল্লাহ বলেন, আপনার জীবনের কসম তারা নিজস্ব ভাবনায় মত্ত। (হিজর ১৫/৬৮-৭২)

অতঃপর জিবরীল (আ.) তাদের দিকে পাখার ঝাপটা মারতেই বীর পুঙ্গরেরা সব অন্ধ হয়ে পালিয়ে গেল। আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ رَاوَدُوْهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِيْ وَنُذُرِ، ‘ওরা লূতের কাছে তার মেহমানদের দাবী করেছিল। তখন আমি তাদের দৃষ্টি বিলুপ্ত করে দিলাম। অতএব আস্বাদন কর আমার শাস্তি ও হুঁশিয়ারী।’ (ক্বমার ৫৪/৩৭)

অতঃপর ফেরেশতাগণ হযরত লূত (আ.)-কে স্বীয় পরিবারবর্গসহ (ক্বমার ৫৪/৩৪) কিছু রাত থাকতেই এলাকা ত্যাগ করতে বললেন এবং বলে দিলেন যেন কেউ পিছন ফিরে না দেখে। তবে আপনার বৃদ্ধা স্ত্রী ব্যতীত। নিশ্চয়ই তার উপর ঐ গযব আপতিত হবে, যা ওদের উপরে হবে। ভোর পর্যন্তই ওদের মেয়াদ। ভোর কি খুব নিকটে নয়? (হূদ ১১/৮১; শু'আরা ২৬/১৭১)।

অতঃপর আল্লাহর হুকুমে অতি প্রত্যুষে গযব কার্যকর হয়। লূত (আ.) ও তাঁর সাথীগণ যখন নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছেন, তখন জিবরীল (আ.) আল্লাহর নির্দেশ পাওয়া মাত্র সুবহে সাদিক-এর সময় এক প্রচণ্ড নিনাদের মাধ্যমে তাদের শহরগুলিকে উপরে উঠিয়ে উপুড় করে ফেলে দিলেন এবং সাথে সাথে প্রবল বেগে ঘূর্ণিবায়ুর সাথে প্রস্তর বর্ষণ শুরু হয়। (হূদ ১১/৮২-৮৩)

এটা ছিল তাদের কুকর্মের সাথে সামঞ্জস্যশীল শাস্তি। কেননা তারা যেমন আল্লাহর আইন ও প্রাকৃতিক বিধানকে উল্টিয়েছিল অর্থাৎ স্ত্রীসঙ্গ বাদ দিয়ে মানুষের স্বভাববিরুদ্ধ ভাবে পুংমৈথুনে ও সমকামিতায় লিপ্ত হয়েছিল, ঠিক তেমনি তাদেরকে মাটি উল্টিয়ে উপুড় করে শাস্তি দেওয়া হলো। কওমে লূত-এর বর্ণিত ধ্বংসস্থলটি বর্তমানে 'বাহরে মাইয়েত' বা 'বাহরে লূত' অর্থাৎ 'মৃত সাগর' বা 'লূত সাগর' নামে খ্যাত। যা ফিলিস্তিন ও জর্ডান নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে বিশাল অঞ্চল জুড়ে নদীর রূপ ধারণ করে আছে। এর পানিতে তৈলজাতীয় পদার্থ বেশি। এতে কোন মাছ, ব্যাঙ এমনকি কোন জলজ প্রাণী বেঁচে থাকতে পারে না। এ কারণেই একে 'মৃত সাগর' বা 'মরু সাগর' বলা হয়েছে।

ইসহাক্ব (আ'লাইহিস সালাম)

ইসহাক্ব (আ.) ছিলেন ইবরাহীম (আ.)-এর প্রথম স্ত্রী সারাহ-এর গর্ভজাত একমাত্র সন্তান। অতি বার্ধ্যক্যের হতাশ বয়সে বন্ধ্যা নারী সারাহ্-কে ইসহাক্ব (আ.)-এর জন্মের সুসংবাদ নিয়ে ফেরেশতা আগমনের ঘটনা আমরা ইতিপূর্বে বিবৃত করেছি। পবিত্র কুরআনে আকর্ষণীয় ভঙ্গীতে এ বিষয়ে আলোচিত হয়েছে সূরা হূদ ৭১-৭৩ আয়াতে,

হিজর ৫১-৫৬ আয়াতে এবং যারিয়াত ২৪-৩০ আয়াতে- যা আমরা ইবরাহীম (আ.) জীবনীতে বর্ণনা করেছি। আল্লাহ ইসমাঈলকে দিয়ে যেমন মক্কার জনপদকে তাওহীদের আলোকে উদ্ভাসিত করেছিলেন, তেমনি ইসহাক্বকে নবুয়াত দান করে তার মাধ্যমে শাম-এর বিস্তীর্ণ এলাকা আবাদ করেছিলেন।

ইবরাহীম (আ.) স্বীয় জীবদ্দশায় পুত্র ইসহাক্ব (আ.)-কে বিয়ে দিয়েছিলেন রাফক্বা বিনতে বাতওয়াঈল এর সাথে। কিন্তু তিনিও বন্ধ্যা ছিলেন। পরে ইবরাহীম (আ.) এর খাছ দু‘আর বরকতে তিনি সন্তান লাভ করেন এবং তাঁর গর্ভে ঈছ ও ইয়াকুব নামে পরপর দু’টি পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করে। তাদের মধ্যে ইয়াকুব (আ.) নবী হন। পরে ইয়াকুবের বংশধর হিসেবে বনু ইসরাঈলের হাজার হাজার নবী পৃথিবীকে তাওহীদের আলোকে আলোকিত করেন। কিন্তু ইহুদী নেতাদের হঠকারিতার কারণে তারা আল্লাহর গযবে পতিত হয় এবং অভিশপ্ত জাতি হিসেবে নিন্দিত হয়, যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

ইসহাক্ব (আ.) ১৮০ বছর বয়সে কেন'আনে মৃত্যুবরণ করেন এবং হেবরনে পিতা ইবরাহীম (আ.)-এর কবরের পাশে তাঁকে সমাহিত হন। স্থানটি এখন ‘আল-খলীল’ নামে পরিচিত। (আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ ১/১৮৪।)

ইয়াকুব (আ'লাইহিস সালাম

ইসহাক্ব (আ.)-এর দুই যমজ পুত্র ঈছ ও ইয়াকুব-এর মধ্যে ছোট ছেলে ইয়াকুব (আ.) নবী হন। ইয়াকুব (আ.) এর উপর আল্লাহর এই বিশাল নিয়ামত ঈছ-এর মনে তীব্র ঈর্ষা সৃষ্টি করল। সে তা দমন করতে না পেরে একপর্যায়ে, ইয়াকুব (আ.)-কে হত্যা করার হুমকি দিল। এজন্য ইয়াকুব (আ.)-এর মা তাঁকে দেশ ছেড়ে মামার বাড়ি ইরাকের হাররানে পালিয়ে যাওয়ার জন্য উপদেশ দিলেন। মায়ের উপদেশ অনুযায়ী ইয়াকুব (আ.) যাত্রা শুরু করলেন। তাঁর ভাই ঈছের থেকে আড়ালে থাকার জন্য তিনি রাতে পথ চলতেন এবং দিনে লুকিয়ে থাকতেন। কিছু আলিমদের মতে, এ কারণেই তাঁর নাম দেয়া হয়েছিল ইসরাঈল। ইসরা অর্থ ভ্রমণ এবং লাইল অর্থ রাত। অর্থাৎ ইসরা

বিল লাইল থেকে ইসরাঈল শব্দ এসেছে। আবার কারো কারো মতে, প্রাচীন ভাষায় ইসরা অর্থ বান্দা এবং ঈল হলো আল্লাহর নাম এবং ইসরাঈল অর্থ আল্লাহর বান্দা।

ইবনে কাছির বর্ণনা করেন, ইয়াকুব (আ.) তাঁর চলার পথে একদিন একটি পাথরের উপরে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। সে অবস্থায় স্বপ্ন দেখেন যে, একদল ফেরেশতা সেখান থেকে আসমানে উঠানামা করছে। এরই মধ্যে আল্লাহ তাকে উদ্দেশ্য করে বলছেন,

إنى سأبارك عليك واكثر ذريتك واجعل لك هذه الأرض ولعقبك من بعدك

‘অতিসত্ত্বর আমি তোমার উপর বরকত নাযিল করব, তোমার সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধি করে দেব, তোমাকে ও তোমার পরে তোমার উত্তরসূরীদের এই মাটির মালিক করে দেব।’ ইয়াকুব (আ.) উৎফুল্ল হয়ে জেগে উঠলেন এবং প্রতিজ্ঞা করলেন যে তিনি এই ভূমিতে আল্লাহর জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করবেন। অতঃপর তিনি ঐ স্থানে পাথরটির উপরে একটি চিহ্ন এঁকে দিলেন যাতে তিনি ফিরে এসে সেটাকে চিনতে পারেন।

এই স্থানেই বর্তমানে বায়তুল মুক্বাদ্দাস অবস্থিত, যা পরবর্তীতে প্রায় ১০০০ বছর পরে সুলায়মান (আ.) পুনঃনির্মাণ করেন। মূলত এটিই ছিল বায়তুল মুক্বাদ্দাসের মূল ভিত্তি ভূমি, যা কা‘বা গৃহের চল্লিশ বছর পরে ফেরেশতাদের দ্বারা কিংবা আদম পুত্রদের হাতে কিংবা ইসহাক্ব (আ.) কর্তৃক নির্মিত হয়। নিশ্চিহ্ন হওয়ার কারণে আল্লাহ ইয়াকুব (আ.)-কে স্বপ্নে দেখান এবং তাঁর হাতে সেখানে পুনরায় ইবাদতখানা তৈরি হয়।

ইসরাঈলী বর্ণনা অনুযায়ী, ইয়াকুব (আ.) হাররানে মামার বাড়িতে গিয়ে তার মামাতো বোন লাইয়া ও পরে রাহীলকে বিবাহ করেন এবং দু’জনের মোহরানা হিসেবে ৭+৭=১৪ বছর মামার বাড়িতে দুম্বা চরান। সেই সময়ের শরী‘আতে দু’বোন একত্রে বিবাহ করা জায়েয ছিল। তাঁর প্রথম স্ত্রীর গর্ভে দশটি পুত্র সন্তান এবং দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে দুটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করল। এই শেষোক্ত স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন বিশ্বসেরা সুদর্শন পুরুষ ইউসুফ (আ.)। পরবর্তীতে দ্বিতীয় পুত্র বিন ইয়ামিনের জন্মের সময় ইয়াকুব (আ.) এর দ্বিতীয় স্ত্রী মৃত্যুবরণ করেন।

হাররানে প্রায় বিশ বছর অতিবাহিত করার পর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা ইয়াকুব (আ.)-কে তাঁর জন্মভূমি কেন'আন তথা হেবরনে ফিরে যাওয়ার জন্য হুকুম দেন। তিনি

আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী হেবরনে ফিরে আসেন এবং পূর্বের মানত অনুসারে, যথাস্থানে বায়তুল মুক্বাদ্দাস মসজিদ নির্মাণ করেন। এরপর তিনি তাঁর সন্তানদের নিয়ে হেবরনেই বসবাস শুরু করেন।

কেন‘আন থেকে মিসরে আসার ১৭ বছর পর মতান্তরে ২৩ বছরের অধিক কাল পরে ইয়াকুব (আ.)-এর মৃত্যু ঘনিয়ে এলে তিনি সন্তানদের কাছে ডেকে ওসিয়ত করেন। সে ওসিয়তটির মর্ম আল্লাহ নিজ যবানীতে বলেন,

وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيْمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلاَ تَمُوْتُنَّ إَلاَّ وَأَنتُمْ مُّسْلِمُوْنَ - أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِن بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَـهَكَ وَإِلَـهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْمَاعِيْلَ وَإِسْحَاقَ إِلَـهاً وَّاحِداً وَّنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ

‘এরই ওসিয়ত করেছিল ইবরাহীম তার সন্তানদের এবং ইয়াকুবও যে, হে আমার সন্তানগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য দ্বীনকে মনোনীত করেছেন। অতএব তোমরা অবশ্যই মুসলিম না হয়ে মরো না। তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে, যখন ইয়াকুবের মৃত্যু ঘনিয়ে আসে? যখন সে সন্তানদের বলল, আমার পরে তোমরা কার ইবাদত করবে? তারা বলল, আমরা আপনার উপাস্য এবং আপনার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক্বের উপাস্যের ইবাদত করব, যিনি একক উপাস্য এবং আমরা সবাই তাঁর প্রতি সমর্পিত।’ (বাক্বারাহ ২/১৩২-১৩৩)

এই ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব (আ.) প্রমুখ নবীগণের ধর্ম ছিল ইসলাম। তাদের মূল দাওয়াত ছিল তাওহীদ তথা আল্লাহর ইবাদতে একত্ব। শুধুমাত্র আল্লাহর স্বীকৃতির মধ্যে তা সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং তাঁর বিধানের প্রতি আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের মধ্যেই তার যথার্থতা নিহিত ছিল। সন্তানের জন্য দুনিয়াবী ধন-সম্পদ রেখে যাওয়ার চাইতে তাদেরকে ঈমানী সম্পদে সম্পদশালী হওয়ার ওসিয়ত করে যাওয়াই হলো দূরদর্শী পিতার প্রধানতম দায়িত্ব ও কর্তব্য।

ইয়াকুব (আ.) ১৪৭ বছর বয়সে মিসরে মৃত্যুবরণ করেন এবং হেবরনে পিতা ইসহাক্ব (আ.)-এর কবরের পাশে সমাধিস্থ হন।

ইউসুফ (আ'লাইহিস সালাম)

ইয়াকুব (আ.)-এর ছিল ১২ জন পুত্র সন্তান। তাদের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন ইউসুফ (আ.); যিনি ছিলেন আল্লাহর একজন নবী। নবীগণের মধ্যে হযরত ইউসুফ (আ.) হলেন একমাত্র নবী, যাঁর সম্পূর্ণ কাহিনী আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা একটি মাত্র সূরায় ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করেছেন।

সালাফদের মধ্যে একজন মন্তব্য করেছেন, কোনো ব্যক্তি যদি সমস্যা এবং দুঃখদুর্দশার মাঝে থাকে এবং নিজের অবস্থার জন্য কষ্ট অনুভব করে, তাহলে সে যেন সূরা ইউসুফ তিলাওয়াত করে। কারণ সূরা ইউসুফ হচ্ছে দুঃখ-কষ্টের কাহিনী। দুনিয়া মানুষকে ধোঁকা দেয়। কাজেই এই দুনিয়ার জীবনে কেউ যদি দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থার মধ্যে সূরা ইউসুফ তিলাওয়াত করে এবং ইউসুফ (আ.)-এর সাথে নিজের জীবনকে মিলিয়ে দেখে তাহলে তার দুঃখ-কষ্ট লাঘব হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। সবশেষে আমরা দেখতে পাই, এত দুঃখ-দুর্দশা শেষে চূড়ান্তভাবে তিনিই বিজয়ী হয়েছেন। তাঁর এই চূড়ান্ত সফলতার পেছনে মূল রহস্য হচ্ছে তাকওয়া এবং সবর।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কাফিরদের মানসিক এবং শারীরিক আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছিলেন, তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তাঁকে স্বান্তনা দেয়ার জন্য বললেন,

نَحۡنُ نَقُصُّ عَلَيۡكَ اَحۡسَنَ الۡقَصَصِ بِمَاۤ اَوۡحَيۡنَاۤ اِلَيۡكَ هٰذَا الۡقُرۡاٰنَ ‌ۖ وَ اِنۡ كُنۡتَ مِنۡ قَبۡلِهٖ لَمِنَ الۡغٰفِلِيۡنَ

"আমি তোমার নিকট সুন্দরতম কাহিনী বর্ণনা করছি, এ কুরআন আমার ওহী হিসেবে তোমার কাছে প্রেরণ করার মাধ্যমে। যদিও তুমি এর পূর্বে অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।" (ইউসুফ ১২/০৩)

ইয়াকুব (আ.) এর ছিল ১২ জন সন্তান। তাদের মধ্যে ইউসুফ (আ.) এর প্রতি পিতা ইয়াকুব (আ.)-এর এক বিশেষ মায়া ছিল। তাঁর শান্ত চোখগুলোয় টগবগ করত এক সুপ্ত প্রতিভা। ছোট্ট ইউসুফ একদিন স্বপ্ন দেখেন যে, ১১টি নক্ষত্র এবং সূর্য ও চন্দ্র তাকে সিজদাহ করছে। তিনি এই স্বপ্ন পিতা ইয়াকুব (আ.)-কে বললে তিনি তাকে সেটা তাঁর ভাইদের থেকে গোপন রাখতে বলেন। কারণ স্বপ্নের ব্যাপারে জানতে পারলে তাঁর ভাইয়েরা তাঁর ক্ষতি করতে পারে। ইয়াকুব (আ.) ছোট্ট শিশুটির স্বপ্নের বর্ণনাটিকে

তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করলেন না, বরং তিনি তাঁর সন্তানের কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনলেন এবং তাঁকে এমন উপদেশ দিলেন যা তাঁকে সাহায্য করবে। সেই সাথে তিনি তাকে মনে করিয়ে দিলেন যে, শয়তান মানুষের প্রকাশ শত্রু। তাঁর ভাইদের প্রতি যেন তাঁর মনে ঘৃণা না জন্মায়, তাই তিনি তাঁকে মনে করিয়ে দিলেন যে, মানুষ যে ভুলগুলো করে থাকে, তা সে মূলত শয়তানের প্ররোচনায় করে। অতএব তুমি তোমার ভাইদের থেকে সাবধানে থেকো, কিন্তু তাদেরকে ঘৃণা করো না।

ইউসুফ (আ.) তাঁর পিতার উপদেশ মেনে চললেও তাঁর প্রতি তাঁর ভাইদের তীব্র হিংসা জন্ম নিল। কেননা তারা লক্ষ্য করেছিল যে, পিতা ইয়াকুব (আ.) ইউসুফকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তারা ইউসুফ (আ.)-কে হত্যার পরিকল্পনা করতে শুরু করল। সব ভাইদের মধ্যে থেকে একজন বলল, ইউসুফকে হত্যা করার দরকার নেই, বরং তাঁকে কূয়ার ভেতরে ফেলে আসা যায়, তাহলে হয়তো ভ্রমণকারী দলগুলোর একটি তাঁকে তাদের সাথে নিয়ে দূরে কোথাও চলে যাবে। তারা পিতাকে বলল, 'আপনি তাকে আগামীকাল আমাদের সাথে প্রেরণ করুন। সে আমাদের সঙ্গে যাবে, তৃপ্তিসহ খাবে আর খেলাধূলা করবে এবং আমরা অবশ্যই তার রক্ষণাবেক্ষণ করব'। জবাবে পিতা বললেন, আমার ভয় হয় যে, তোমরা তাকে নিয়ে যাবে, আর কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে তাকে বাঘে খেয়ে ফেলবে'। 'তারা বলল, আমরা এতগুলো ভাই থাকতে তাকে বাঘে খেয়ে ফেলবে, তাহলে তো আমাদের সবই শেষ হয়ে যাবে।' (ইউসুফ ১২/১২-১৪)

ছেলেদের পীড়াপীড়িতে অনিচ্ছাকৃতভাবে ইয়াকুব (আ.) ইউসুফ (আ.)-কে নিয়ে খেলতে যাওয়ার জন্য তাদের অনুমতি দিলেন। তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী, বাইরে যাওয়ার পর তাদের এই নিষ্পাপ ভাইটিকে তারা কূয়াতে ফেলে দিল এবং ফেলার আগে তাঁর পরিধেয় কাপড়টা খুলে নিয়ে তাতে নকল রক্ত মাখিয়ে দিল। এরপর তারা সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে কাঁদতে কাঁদতে পিতার কাছে হাজির হয়ে ইউসুফকে বাঘে নিয়ে গেছে বলে কৈফিয়ত পেশ করল। প্রমাণ স্বরূপ তারা ইউসুফ (আ.)-এর রক্ত মাখা জামা পেশ করল। হতভাগারা এটা বুঝেনি যে, বাঘে নিয়ে গেলে জামাটা খুলে রেখে যায় না। আর খুললেও বাঘের নখের আঁচড়ে জামা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবার কথা। তাছাড়া যে পিতার কাছে তারা মিথ্যা কৈফিয়ত পেশ করছে, তিনি একজন নবী। অহীর মাধ্যমে তিনি সবই জানতে পারবেন। কিন্তু হিংসায় অন্ধ হয়ে গেলে মানুষ সবকিছু ভুলে যায়।

ইয়াকুব (আ.)-এর বুঝতে দেরি হলো না যে, তাঁর ছেলেরা মিথ্যা বলছে। তাই তিনি বললেন, ‘প্রকৃতপক্ষে, তোমাদের নফস তোমাদের খুব নিকৃষ্ট কিছু করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। তাই আমার জন্য সবর করাই সর্বোত্তম এবং তোমরা যা কিছু বর্ণনা করছো, সে ব্যাপারে আমি কেবল আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইছি।’

অন্যদিকে, ধূ-ধূ মরুভূমির মধ্য দিয়ে এক কাফিলা যাত্রা করছিল। তারা তাদের একজন লোককে পানির সন্ধানে পাঠিয়ে দিল। সেই লোক কূয়া থেকে পানি তোলার জন্য যেই না তার বালতি নামিয়ে দিল, অমনি সে খেয়াল করল, ওই অন্ধকার কূয়ার মধ্যে দুটি চোখ জ্বলজ্বল করে তাকিয়ে আছে। সে আনন্দিত হয়ে ছোট্ট বালকটিকে কূয়া থেকে বের করে আনলো এবং সহযাত্রীদের সুসংবাদ জানালো। কাফিলার লোকেরা অবাক হয়ে দেখলো, ফুটফুটে একটা বাচ্চা তাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ছোট্ট ইউসুফ (আ.) তাকিয়ে ছিলেন অজানা চেহারাগুলোর দিকে। তিনি জানতেন না তাঁর জন্য কেমন রহস্যময় ভবিষ্যত অপেক্ষা করছে। শুধু যখন তাঁর সব ভাইয়েরা তাঁকে কূয়ায় নিক্ষেপ করেছিল, তখন তাঁর অন্তরে এক অলৌকিক বাণী এসে তাঁকে জানিয়ে দিয়েছিল, "একদিন তুমি তাদেরকে তাদের এই অপরাধের কথা স্মরণ করিয়ে দিবে, কিন্তু তারা তোমাকে চিনতেও পারবে না।" (ইউসুফ ১২/১৫)
কবে, কিভাবে এই ঘটনা ঘটবে ইউসুফ তা জানতেন না। শুধু আল্লাহর উপর দৃঢ় বিশ্বাস রেখে তিনি যাত্রা আরম্ভ করলেন এই অচীন দেশের ভ্রমণকারীদের সাথে। অন্ধকূপ থেকে উদ্ধার পাওয়ার পর ব্যবসায়ী কাফিলা তাকে বিক্রির জন্য মিসরের বাজারে উপস্থিত করল। মানুষ কেনা-বেচার সেই হাটে এই অনিন্দ্য সুন্দর বালককে দেখে বড় বড় ধনশালী খরিদ্দাররা রীতিমত প্রতিযোগিতা শুরু করল। কিন্তু আল্লাহ পাক তাকে মর্যাদার স্থানে সমুন্নত করতে চেয়েছিলেন। তাই সব খরিদ্দারকে ডিঙিয়ে মিসরের তৎকালীন অর্থ ও রাজস্বমন্ত্রী ক্বিৎফীর তাকে খরিদ করে নিলেন। তার উপাধি ছিল আল আযীয। তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। ইউসুফকে ক্রয় করে এনে তিনি তাকে স্বীয় স্ত্রীর হাতে সমর্পণ করে বললেন, একে সন্তানের ন্যায় উত্তম রূপে লালন-পালন করো, এর থাকার জন্য উত্তম ব্যবস্থা করো। ভবিষ্যতে সে আমাদের কল্যাণে আসবে। বস্তুত ইউসুফের অসাধারণ চেহারা ও নম্র-ভদ্র ব্যবহারে তাদের মধ্যে সন্তানের মমতা জেগে ওঠে। আযীয তার দূরদর্শিতার মাধ্যমে ইউসুফের মধ্যে ভবিষ্যতের অশেষ কল্যাণ দেখতে পেয়েছিলেন। আর সেজন্য তাকে সর্বোত্তম যত্ন সহকারে রাখার ব্যবস্থা

করেছিলেন। মূলত এসবই ছিল আল্লাহর পূর্ব-নির্ধারিত। এ বিষয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলছেন,

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لاِمْرَأَتِهِ أَكْرِمِيْ مَثْوَاهُ عَسَى أَن يَّنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَكَذَلِكَ مَكَّنِّا لِيُوْسُفَ فِي الأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيْلِ الأَحَادِيْثِ وَاللهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ

'মিসরে যে ব্যক্তি তাকে ক্রয় করল, সে তার স্ত্রীকে বলল, একে সম্মানজনকভাবে থাকার ব্যবস্থা কর। সম্ভবত সে আমাদের কল্যাণে আসবে অথবা আমরা তাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করে নেব। এভাবে আমরা ইউসুফকে সেদেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম এবং এজন্যে যে তাকে আমরা বাক্যাদির পূর্ণ মর্ম অনুধাবনের পদ্ধতি বিষয়ে শিক্ষা দেই। আল্লাহ স্বীয় কর্মে সর্বদা বিজয়ী। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।' (ইউসুফ ১২/২১)

আযীযের গৃহে কয়েক বছর পুত্র স্নেহে লালিত পালিত হয়ে ইউসুফ অতঃপর যৌবনে পদার্পণ করলেন। আল্লাহ বলেন,

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْماً وَّعِلْماً وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ

'অতঃপর যখন সে পূর্ণ যৌবনে পৌঁছে গেল, তখন আমরা তাকে প্রজ্ঞা ও ব্যুৎপত্তি দান করলাম। আমরা এভাবেই সৎকর্মশীলদের প্রতিদান দিয়ে থাকি।' (ইউসুফ ১২/২২)

জ্ঞান ও বিচক্ষণতার অধিকারী হওয়ার পাশাপাশি তিনি বেড়ে উঠলেন অবিশ্বাস্য রকমের সুদর্শন একজন যুবক হয়ে। এজন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ মিরাজের রাতে তাঁকে দেখে বলেছিলেন, 'আল্লাহ যেন তাঁকে সৌন্দর্যের অর্ধেক দিয়ে দিয়েছেন।' (মুসলিম-১৬২)

এই অনিন্দ্য সুন্দর মোহনীয় রূপও তাঁর জন্য এক বিরাট পরীক্ষার কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং এটা তাঁর জন্য সর্বনাশও বয়ে আনতে পারতো, যদি তাঁর অন্তরটি তাঁর বাহ্যিক রূপের চেয়েও অধিক মুগ্ধকর না হত! রূপ-লাবণ্যে ভরা ইউসুফ (আ.)-এর প্রতি আযীযের স্ত্রী যুলায়খার অন্যায় আকর্ষণ জেগে উঠলো। ইউসুফ (আ.) ছিলেন তার জন্য এক বড় ধরনের পরীক্ষা এবং সে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলো না। একদিন সুযোগ বুঝে, আযীযের স্ত্রী ইউসুফ (আ.)-কে ঘরে একা পেয়ে দৌড়ে গিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল এবং ইউসুফ (আ.)-কে কুপ্রস্তাব দিতে লাগলো। এমন একটি অবস্থায়, আযীযের অনুপস্থিতিতে গোটা দেশের সবচেয়ে প্রভাবশালী এবং অত্যন্ত রূপবতী নারী

যখন ইউসুফ (আ.)-কে নির্জনে কামনার ঘোরে মত্ত হয়ে তার সাথে যিনায় লিপ্ত হওয়ার প্রস্তাব দেয়, তখন তাঁর প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল? তিনি বললেন,

قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهٗ رَبِّیۡۤ اَحۡسَنَ مَثۡوَایَ ؕ اِنَّهٗ لَا یُفۡلِحُ الظّٰلِمُوۡنَ ۝

“সে বলল, আল্লাহর আশ্রয় (চাই)। নিশ্চয় তিনি আমার মনিব, তিনি আমার থাকার সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন। নিশ্চয় যালিমগণ সফল হয় না।” (ইউসুফ ১২/২৩)

ইউসুফ (আ.)-এর এই পরীক্ষা যে ঠিক কতখানি কঠিন ছিল, তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা নিজেই পরের আয়াতে উল্লেখ করেছেন,

وَ لَقَدۡ هَمَّتۡ بِهٖ ۚ وَ هَمَّ بِهَا لَوۡ لَاۤ اَنۡ رَّاٰ بُرۡهَانَ رَبِّهٖ ؕ كَذٰلِكَ لِنَصۡرِفَ عَنۡهُ السُّوۡٓءَ وَ الۡفَحۡشَآءَ ؕ اِنَّهٗ مِنۡ عِبَادِنَا الۡمُخۡلَصِیۡنَ ۝

"সেই মহিলা তার প্রতি আসক্ত হয়েছিল আর সে (ইউসুফ)ও তার প্রতি আসক্ত হয়েই যেত যদি সে তার প্রতিপালকের নিদর্শন না দেখত। আমি তা দেখিয়েছিলাম তাকে অসৎ কর্ম ও নির্লজ্জতা থেকে সরিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে, সে ছিল বিশুদ্ধ-হৃদয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।" (ইউসুফ ১২/২৪)

অর্থাৎ আল্লাহর নিদর্শন না পেলে, ইউসুফ (আ.)-এর মতো পবিত্র চরিত্রের মানুষও এক কঠিন মূহুর্তে দূর্বল হয়ে যেতে পারতেন। এ ক্ষেত্রে আল্লাহর নিদর্শন বলতে কি বোঝানো হয়েছে তা নিয়ে মুফাসসিরদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কিন্তু মূল বিষয়টি এই যে, ইউসুফ (আ.) আল্লাহর সাহায্যেই এই পরিস্থিতিতে এমন মহান চরিত্রের পরিচয় দিতে পেরেছেন। কিন্তু আযীযের স্ত্রী ইউসুফ (আ.)-এর মতো নিজেকে আগলে রাখতে পারেনি। সে নিজেকে ইউসুফ (আ.)-এর দিকে ছড়িয়ে দিয়েছিল এবং ইউসুফ (আ.) পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে সে তাঁর জামা পিছন দিক থেকে টেনে ধরে; যার ফলে তাঁর জামার একাংশ ছিঁড়ে যায়। ঠিক এমন সময়, দরজায় আযীয উপস্থিত হন। তাকে দেখে তার স্ত্রী হকচকিয়ে গিয়ে বলল, যে ব্যক্তি তোমার স্ত্রীর সাথে অন্যায় বাসনা করে, তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা অথবা (অন্য কোনো) যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেওয়া ব্যতীত আর কি সাজা হতে পারে? ইউসুফ (আ.) প্রতিবাদ করে বললেন, সেই-ই আমাকে (তার কুমতলবে সিদ্ধ করার জন্য) ফুসলিয়েছে। তখন মহিলার পরিবারের জনৈক ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল যে, যদি ইউসুফের জামা সামনের দিকে ছেঁড়া হয়, তাহলে মহিলা সত্য কথা বলেছে এবং ইউসুফ মিথ্যাবাদী আর যদি তার জামা পিছন দিক

থেকে ছেঁড়া হয়, তবে মহিলা মিথ্যা বলেছে এবং ইউসুফ সত্যবাদী। অতঃপর আযীয যখন দেখলো যে, ইউসুফ (আ.)-এর জামা পিছন দিক থেকে ছেঁড়া, তখন সে (স্বীয় স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে) বলল, ‘এটা তোমাদের ছলনা। নিঃসন্দেহে তোমাদের ছলনা খুবই মারাত্মক। (অতঃপর তিনি ইউসুফ (আ.)-কে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন,) ইউসুফ! এ প্রসঙ্গ ভুলে যাও। আর হে মহিলা! এ পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চিতভাবে তুমিই পাপাচারিনী।’

কিন্তু ব্যাপারটা এখানেই থেমে গেল না। চারিদিকে খবর ছড়িয়ে গেল যে আযীযের স্ত্রী তার গৃহের দাসকে যিনায় আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেছে। ঘটনাটি যেন তাৎক্ষণিকভাবে শহরের নারীদের মাঝে আলোচনার মূল বিষয়বস্তু হয়ে উঠলো। আযীয স্ত্রী এ ব্যাপারে জানতে পারলে বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য সে শহরের উচ্চশ্রেণীর মহিলাদের নিজ বাড়িতে ভোজসভায় দাওয়াত দেবার মনস্থ করলো এবং খাবার শেষে ফল কাটার জন্য তাদের হাতে ছুরি ধরিয়ে দিল। ইউসুফ (আ.)-কে খুব সম্ভবত খাবার পরিবেশন করার ছলে সে সবার সামনে পাঠিয়ে দিল। ইউসুফ (আ.) ঘরে প্রবেশ করার সাথে সাথে মহিলারা তাঁর রূপে বিমোহিত হয়ে ছুরি দিয়ে ফল কাটার বদলে নিজেদের হাত কেটে ফেলল। মহিলাদের এই অবস্থা দেখে উৎসাহিত হয়ে আযীয স্ত্রী বলে উঠলো, এই হলো সেই যুবক, যার জন্য তোমরা আমাকে তিরস্কার করছো। আমি তাকে প্ররোচিত করেছিলাম। কিন্তু সে নিজেকে সংযত রেখেছে। এক্ষণে আমি তাকে যা আদেশ দেই, তা যদি সে পালন না করে, তাহলে সে অবশ্যই কারাগারে নিক্ষিপ্ত হবে এবং সে অবশ্যই লাঞ্ছিত হবে।’ (ইউসুফ ১২/৩০-৩২)

অর্থাৎ আযীযের স্ত্রী যখন দেশের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের স্ত্রীদের দাওয়াত করে এনে ইউসুফ (আ.)-কে দ্বিতীয় বার অপকর্মে লিপ্ত করার চেষ্টা করল এবং এবার জোরপূর্বক তাঁকে যিনায় উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করল তখন ইউসুফ (আ.) তাঁর রবের দিকে ফিরে বললেন,

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِيْ إِلَيْهِ وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّيْ كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِيْنَ

‘হে আমার পালনকর্তা! এরা আমাকে যে কাজের দিকে আহবান জানাচ্ছে, তার চাইতে কারাগারই আমার নিকটে অধিক পছন্দনীয়। (হে আল্লাহ!) যদি তুমি এদের চক্রান্তকে

আমার থেকে ফিরিয়ে না নাও, তবে আমি (হয়তো) তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং আমি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।' (ইউসুফ ১২/৩৩)

ইউসুফ (আ.) নিজে থেকে কারাবন্দী হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তাঁর এর দু'আ কবুল করলেন এবং তাঁর জন্য তা-ই নির্ধারণ করে রাখলেন, যা তাঁর জন্য শ্রেয়। আযীযের মনে হলো, যেহেতু ইউসুফকে ঘিরে এত ঝামেলা চলছে, তাই তাকে কারাবন্দী করে রাখাই ভালো। বাস্তবে এটা ছিল আল্লাহরই হুকুম, যার মাধ্যমে ইউসুফ (আ.) শহরের নারীদের খারাপ পরিকল্পনা থেকে সুরক্ষিত হয়েছিলেন। আল আযীয ইউসুফ (আ.)-কে কারাগারে বন্দী করার আদেশ করলেন; যদিও তিনি জানতেন যে ইউসুফ (আ.) নির্দোষ ছিলেন। ইউসুফ (আ.)-এর সাথে কারাগারে আরও দুজনকে বন্দী করা হলো। ঐতিহাসিকদের মতে, তারা ছিল বাদশাহর প্রাসাদের কর্মচারী। একজন রুটি তৈরি করত, অপরজন মদ্য তৈরি করত এবং তাদের উভয়কেই খাবারে বিষ মেশানোর অভিযোগে কারাগারে বন্দী করা হয়েছিল। তিনজন একইসাথে কারাগারে দিন কাটাতে থাকে। এক রাতে সেই দুই যুবক স্বপ্ন দেখলো। ঘুম থেকে উঠে তারা অন্যদের কাছে স্বপ্নের বর্ণনা করল। একজন বলল, আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি মদ তৈরি করছি এবং অন্যজন বলল, আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমার মাথায় রুটি রাখা আছে এবং পাখিরা তা খাচ্ছে।

দুই যুবক মিলে ইউসুফ (আ.)-কে বলল, 'আমরা এই কদিনে যা দেখেছি, আপনি নিশ্চয়ই একজন আল্লাহওয়ালা ব্যক্তি; সুতরাং আপনি আমাদের এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিন।' অর্থাৎ যে কদিন তারা ইউসুফ (আ.)-এর সাথে কারাগারে ছিল, সেই অল্প সময়ের ভিতরেই তারা তাঁর কর্মকাণ্ড দেখে এতটা মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল যে তারা নিশ্চিত ছিল যে তাঁর প্রতি আল্লাহর কোনো বিশেষ রহমত ছিলেন এবং তিনি অত্যন্ত ভালো মানুষ ছিলেন। কিন্তু তাদের জানা ছিল না যে, স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারাটাই ছিল ইউসুফ (আ.)-এর বিশেষ দক্ষতা, যা ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি এক বিশেষ নিয়ামত। ইউসুফ (আ.) তাদের অনুরোধ শুনে বললেন, 'তোমরা যা জানতে চাচ্ছো তা আমি অবশ্যই তোমাদের জানাবো। তোমাদের পরবর্তী খাবারের সময় হওয়ার আগেই আমি তা তোমাদের জানিয়ে দিব। কিন্তু তার আগে তোমাদের সাথে কিছু কথা বলতে চাই। এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে পারার নিয়ামত আমাকে আমার রব দিয়েছেন।' এরপর তিনি তাঁর রব সম্পর্কে তাদেরকে বলা আরম্ভ করলেন এবং এভাবেই ইউসুফ (আ.)

সেই যুবকদের কাছে এক আল্লাহর বাণী প্রচার করেন। তিনি তাদেরকে আরও বললেন, আমি তাদের ধর্মকে পরিহার করেছি, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না এবং আখিরাতকে অস্বীকার করে। এ থেকে আমরা এটাও বুঝতে পারি যে, সে সময় মিশরে সর্বত্র শিরক ছড়িয়ে পড়েছিল। কারাগারের এমন কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও ইউসুফ (আ.) নিজের সাধ্যমতো দাওয়াতী কাজ চালিয়ে গেছেন। ইসলামের ইতিহাস জুড়ে আমরা এমনটাই দেখতে পাই যে, বহু বড় বড় আলিমদের যখন সে সময়ের সরকার অন্যায়ভাবে কারাবন্দী করে রেখেছিল তখন তারা সেই কারাগারের ভিতরেই মানুষকে ইসলামের শিক্ষা দিয়ে গিয়েছিলেন। এমনকি সেই কারাগার থেকেই ইসলামি স্কলারদের এক প্রজন্ম গড়ে তুলেছিলেন। তাই একজন প্রকৃত মুসলিম সব অবস্থাতেই চেষ্টা করে গঠনমূলক কিছু তৈরি করার, যা দুনিয়া এবং আখিরাতে কল্যাণ বয়ে আনবে।

ইউসুফ (আ.) তাঁর কারাগারের সাথীদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন, ‘তোমাদের মধ্যে একজন বাদশাহকে শরাব পান করাবে এবং অন্যজনকে শূলে চড়ানো হবে, পাখিরা তার মাথা ঠুকরে ঠুকরে খাবে। আর এই বিষয়ের ফায়সালা হয়ে গিয়েছে।’
যেই যুবক রেহাই পেতে যাচ্ছিলো তাকে ইউসুফ (আ.) আরও বললেন, ‘তুমি যখন ছাড়া পাবে, তখন তোমার বাদশাহকে আমার কথা বলো।' অর্থাৎ তিনি তাঁর এই স্বপ্ন ব্যাখ্যা করার কথা জানিয়ে দিতে বলেছিলেন। তিনি নিশ্চয়ই আশা করছিলেন, যদি তাঁর এই অলৌকিক ক্ষমতার কথা বাদশাহ জানতে পারেন, তাহলে তিনি তাঁকে মুক্ত করবেন এবং তাঁর কথা গুরুত্ব দিয়ে শুনবেন। ফলে ইউসুফ (আ.) সমাজের সর্বোচ্চ পর্যায়ে ইসলামের বাণী প্রচার করতে পারবেন। কিন্তু শয়তান সেই যুককটিকে এমনভাবে গাফিল করে দিল যে সে কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর ইউসুফ (আ.)-এর কথা বাদশাহর কাছে উল্লেখ করতে ভুলেই গেল এবং এর ফলে ইউসুফ (আ.) আরও কয়েক বছর ধরে কারাগারেই পড়ে রইলেন।

বছর খানেক পরের কথা। একদিন মিশরের বাদশাহ একটি স্বপ্ন দেখলেন। তিনি দেখলেন যে, সাতটি মোটা গাভীকে সাতটি রুগ্ন গাভী খেয়ে ফেলছে এবং সাতটি সবুজ শীষের পাশে সাতটি শুকনো শীষ রয়েছে। ঘুম থেকে উঠে, বাদশাহ তার সভাসদগণকে ডেকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করেন। কিন্তু কেউ সঠিক জবাব দিতে পারল না। এক পর্যায়ে, বাদশাহর এই স্বপ্নের কথা সেই যুককের কাছে পৌঁছালো যে ইউসুফ (আ.)-

এর সাথে কারাগারে ছিল। তার তখন ইউসুফ (আ'লাইহিস সালাম)-এর স্বপ্ন ব্যাখ্যা করার সেই বিশেষ ক্ষমতার কথা মনে পড়লো। তাই সে বাদশাহর কাছে গিয়ে ইউসুফ (আ.)-এর স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেয়ার ক্ষমতা সম্পর্কে জানালো। বাদশাহর অনুমতিতে যুবকটি ইউসুফ আ'লাইহিস সালাম)-এর কাছে এসে বাদশাহর স্বপ্নের বিবরণ দিল এবং তাঁর কাছে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইলো। তিনি জবাবে বললেন, 'তোমরা সাত বছর উত্তমরূপে চাষাবাদ করবে। অতঃপর যখন ফসল কাটবে, তখন খোরাকি বাদে বাকি সব শীষ জমিয়ে রাখবে। কারণ এরপর আসবে দুর্ভিক্ষের সাত বছর। সে সময়ের জন্য তোমাদের প্রথম সাত বছর শস্য জমিয়ে রাখতে হবে, নতুবা প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে। এরপরে আসবে এক বছর, যাতে রহমতের বৃষ্টিধারার মাধ্যমে মানুষের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা হবে।'

ইউসুফ (আ.)-এর এই ব্যাখ্যা জানতে পেরে বাদশাহ অভিভূত হলেন এবং ইউসুফ (আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে চাইলেন। কিন্তু ইউসুফ (আ.) ততক্ষণ পর্যন্ত কারাগার থেকে মুক্তি পাবার জন্য রাজি হলেন না, যতক্ষণ না তাঁর নির্দোষিতা প্রমাণিত হয়। তিনি বাদশাহর কাছে বার্তা পাঠালেন এবং মহিলাদের হাত কেটে ফেলার ঘটনার ব্যাপারে তদন্ত করার জন্য আর্জি পেশ করলেন। বাদশাহ ইউসুফ (আ.)-এর দৃঢ়তা দেখে আরও অভিভূত হয়ে গেলেন এবং সেই নারীদের জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তারা প্রত্যেকেই আল্লাহ কসম করে স্বীকার করে নিল যে, ইউসুফ (আ.) নির্দোষ ছিলেন। বাদশাহ ইউসুফ (আ.)-এর নানা গুণাগুণ পেয়ে এতটাই মুগ্ধ হয়ে গেলেন যে তাঁকে তিনি তার ব্যক্তিগত উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দিলেন। ইউসুফ (আ.) অনুরোধ করলেন যেন তাকে রাজ্যের কোষাগারের দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি তাঁর মেধা ও জ্ঞান দিয়ে দেশের অর্থসম্পদ পরিচালনা করবেন। ইউসুফ (আ.) কখনোই ক্ষমতার লোভের জন্য দায়িত্ব চেয়ে নেননি। বরং তিনি ভালো করেই জানতেন যে, এই দায়িত্ব তিনি না নিলে সারা দেশে অরাজকতা ছড়িয়ে পড়বে। আর এভাবেই কূয়ায় নিক্ষিপ্ত হওয়া ছোট্ট শিশুটি আল্লাহর ইচ্ছায় সেই সময়ের মানবসভ্যতার সবচেয়ে শক্তিশালী জাতির অর্থমন্ত্রী হিসেবে নিয়োজিত হলেন।

মাস গড়িয়ে বছর পার হয়ে গেল এবং ইউসুফ (আ.)-এর নির্দেশনা মতে, প্রতিবছর যেই ফসল হত, তার বেশিরভাগই জমিয়ে রাখা হত; শুধু ততটুকু ব্যতীত যতটুকু সেই

বছর চলার জন্য প্রয়োজন ছিল। এভাবেই সাতটি বছর পার হয়ে গেল এবং ইউসুফ (আ.) এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী, পরের বছর থেকেই দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হলো। এই দুর্ভিক্ষ এতটাই তীব্র আকার ধারণ করলো যে, শুধু মিশরেই নয়, বরং মিশরের আশেপাশের অঞ্চলেও তা ছড়িয়ে পড়লো। আশেপাশের মানুষেরা মিশরের লোকেদের মতো প্রস্তুতি না নেওয়ায় খাদ্য সংকটে পড়ে গেল এবং মিশরে এখনো ফসল পাওয়া যাচ্ছে জানতে পেরে তারা দলে দলে মিশরে ভ্রমণ করা শুরু করল। সেই দলগুলোর মধ্যে একটি দল ছিল ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা। সেই ভাইয়েরা, যারা বহু বছর আগে ছোট্ট ইউসুফকে হিংসা করে কূয়ার গভীরে ফেলে দিয়েছিল। দুর্ভিক্ষ থেকে পালিয়ে ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা আজ সুদূর ফিলিস্তিন থেকে মিশরে ভ্রমণ করে এসেছে। অথচ তারা জানতো না, যেই রাজ্যে তারা এসেছে, সেই রাজ্যের অর্থ-সম্পদের চূড়ান্ত দায়িত্বে ছিল তাদের সেই কূয়ায় ফেলে দেয়া ভাইটি। তারা এসে প্রথমে ইউসুফ (আ.)-এর সাথেই দেখা করল এবং তাদেরকে দেখা মাত্রই ইউসুফ (আ.) তাদের চিনে ফেললেন। কিন্তু তারা তাঁকে চিনতে পারলো না। ভাইয়েরা খাবারের বিনিময়ে তাদের সাথে থাকা মালপত্র দিয়ে দিতে চাইলো। কিন্তু ইউসুফ (আ.) তাঁর লোকদের গোপনে সেই মালগুলো তাঁর ভাইদের থলেতেই রেখে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। অর্থাৎ তাঁর ভাইয়েরা যে খাবার নিয়ে যাচ্ছিলো, তা ছিল পুরোপুরি ইউসুফ (আ.)-এর পক্ষ থেকে সাদাকাহ। হয়তো, তাঁর পিতার প্রতি ভালোবাসা থেকেই তিনি এই কাজটি করেছিলেন। এই প্রক্রিয়ার সময়, তিনি তাঁর ভাইদের সাথে কথা বললেন এবং তাদের সম্পর্কে সমস্ত বিষয় জানতে চাইলেন। তারা জানালো তারা সুদূর ফিলিস্তিন থেকে এসেছে এবং কথার এক পর্যায়ে তারা এও বলল যে, 'তাদের আরও একটি ভাই আছে। কিন্তু সেই ভাইটি তাদের পিতার সাথে তাদের দেশেই রয়ে গিয়েছে।' সেই ভাইটি ছিল বিন ইয়ামিন, যে ছিল ইউসুফ (আ.)-এর আপন ভাই। ইউসুফ (আ.)-কে হারানোর পর থেকে ইয়াকুব (আ.)-এর কাছে বিন ইয়ামিন হয়ে গেল সবচেয়ে প্রিয় এবং ব্যাপারটা পরিস্কার হলো যে, তিনি বিন ইয়ামিনকে তার সৎ ভাইদের সাথে কোথাও যেতে দিতেন না।

ইউসুফ (আ.) বললেন, 'তোমাদের যা যা প্রয়োজন আমি কি তা দিয়ে তোমাদের সাহায্য করিনি?' তারা বলল, 'অবশ্যই, হে মহান মন্ত্রী!' তিনি বললেন, 'তোমরা যা বলছো, তার সত্যতা প্রমাণ হিসেবে আগামীতে তোমরা তোমাদের সেই ভাইটিকে নিয়ে না আসলে, তোমাদের সাথে কোনোপ্রকার লেনদেন করা হবে না।'

বাস্তবে ইউসুফ (আ.) তাঁর আপন ভাইয়ের সাথে পুনরায় মিলিত হতে চাচ্ছিলেন। তাঁর ভাইয়েরা জানালো যে, তারা তাদের পিতাকে বোঝাতে সাধ্যমতো চেষ্টা করবে, যেন তিনি বিন ইয়ামিনকে তাদের সাথে পাঠাতে রাজি হন। তারা ইউসুফ (আ.)-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিলিস্তিনে ফিরে গেল। ফিরে গিয়ে তারা খেয়াল করল যে, মিশরের এই মহান নেতা শুধুমাত্র তাদেরকে তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় মালামালই দেননি, বরং তারা যে সমস্ত জিনিস লেনদেনের জন্য দিয়েছিল, সেগুলোও তাঁর উদারত্বের উদাহরণস্বরূপ তাদের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। তারা মনস্থির করল, যেভাবেই হোক, তাদেরকে মিশরে তাদের ভাইকে নিয়ে যেতে হবে, যেন তারা সেখানে বেশি বেশি লেনদেন করতে পারে। তারা পিতা ইয়াকুব (আ.)-এর কাছে গিয়ে বিন ইয়ামিনকে তাদের সাথে পাঠানোর জন্য অনুনয় করতে থাকলো এবং এও জানালো যে, তাকে না পাঠানো হলে, এই দুর্ভিক্ষের মধ্যে মিশর থেকে তারা আর মালামাল নিয়ে আসতে পারবে না। কারণ তাকে ছেড়ে গেলে সেখানকার মন্ত্রী খাদ্যশস্য দিবেন না বলে স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন। জবাবে পিতা ইয়াকুব (আ.) বললেন, তার সম্পর্কে তোমাদের কিভাবে বিশ্বাস করব যখন ইতিপূর্বে তোমরা তার ভাই ইউসুফ সম্পর্কে বিশ্বাসভঙ্গ করেছো?' অতঃপর পরিবারের অভাব-অনটনের কথা ভেবে ছেলেদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়ে তিনি বিন ইয়ামিনকে তাদের সাথে যাবার অনুমতি দিলেন।
তিনি বিন ইয়ামিনকে আল্লাহর হাতেই সোপর্দ করলেন। আল্লাহ তাঁর বান্দার এই আকুতি শুনলেন। অতঃপর ইয়াকুব (আ.) ছেলেদেরকে কিছু উপদেশ দেন, যার মধ্যে তাঁর বাস্তববুদ্ধি ও দূরদর্শিতার প্রতিফলন ঘটেছে। তিনি তাদেরকে একসাথে একই প্রবেশদ্বার দিয়ে মিসরের রাজধানীতে প্রবেশ করতে নিষেধ করেন। বরং তাদেরকে পৃথক পৃথক ভাবে বিভিন্ন দরজা দিয়ে শহরে প্রবেশ করতে বলেন। কেননা তিনি ভেবেছিলেন যে, একই পিতার সন্তান সুন্দর ও সুঠামদেহী ১১ জন ভিনদেশীকে একত্রে এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে দেখলে অনেকে মন্দ কিছু সন্দেহ করবে। তাছাড়া প্রথমবার সফরে মিসররাজ তাদের প্রতি যে রাজকীয় মেহমানদারী প্রদর্শন করেছেন, তাতে অনেকের মনে হিংসা জেগে থাকতে পারে এবং তারা তাদের ক্ষতি করতে পারে অথবা তাদের কুদৃষ্টি লাগতে পারে।

অতঃপর ইয়াকুব (আ.)-এর ছেলেরা মিশরের দিকে রওনা দিল এবং তাঁর নির্দেশ মতে, পৃথক পৃথক দরজা দিয়ে প্রবেশ করে ইউসুফ (আ.)-এর দরবারে একত্র হলো। ইউসুফ

(আ.) কোনো এক সুযোগে তাঁর আপন ভাই বিন ইয়ামিনকে আলাদা করে ডেকে নিলেন এবং তাঁর আসল পরিচয় তাকে জানালেন। তিনি বিন ইয়ামিনকে তাঁর সাথে রেখে দেয়ার জন্য একটি পরিকল্পনা করলেন। তিনি বিন ইয়ামিনের একটি থলেতে রাজ্যের একটি পেয়ালা গোপনে রেখে দিলেন। এরপর তাঁর ভাইয়েরা যখন লেনদেন শেষে ফিলিস্তিনের উদ্দেশ্যে রওনা হলো তখন একজন রক্ষী এসে চিৎকার দিয়ে বলল, 'হে যাত্রীদল, তোমরা তো চুরি করেছো।' তারা পেছনে ফিরে অবাক হয়ে বলল, 'তোমাদের কী চুরি হয়েছে?' সে বলল, 'আমরা বাদশাহর পেয়ালা পাচ্ছি না।' এরপর তল্লাশি শুরু হলো। বিন ইয়ামিনের থলেতে ইউসুফ (আ.)-এর রেখে দেয়া পেয়ালাটি পাওয়া গেল এবং বাকি ভাইয়েরা অত্যন্ত রাগান্বিত আর লজ্জিত হয়ে ইউসুফ (আ.)-এর সামনে তাদের মুখ রক্ষা করার জন্য বলল, 'আসলে ও যদি চুরি করেও থাকে এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ এর আগে তার এক ভাইও চুরি করেছিল।'

তারা নিজের অজান্তেই, যে মানুষটির সামনে নিজেদের মুখ রক্ষা করতে চাচ্ছিলো, সেই মানুষটির নামেই চুরির মিথ্যা অপবাদ দিয়ে দিল। ইউসুফ (আ.) তাদের এমন মিথ্যা শুনেও চুপ করে রইলন। তারা এরপর ইউসুফ (আ.)-কে বিনীত ভাবে বলল, 'হে মহান আযীয, এই ছেলেটির পিতা অত্যন্ত বৃদ্ধ। এর জায়গায় আপনি আমাদের কাউকে রেখে দিন।' ইউসুফ (আ.) একজনের দোষের শাস্তি আরেকজনকে দিতে রাজি হলেন না। বিন ইয়ামিনকে ছেড়ে যখন তারা বেরিয়ে এলো, তখন তাদের বড় ভাই অন্য ভাইদের বলল, তোমরা পিতার কাছে ফেরত যাও এবং তাঁকে সব খুলে বলো। আমি এখান থেকে ফেরত যাব না, যতক্ষণ না পিতা আমাকে আদেশ দেন কিংবা আল্লাহ আমার জন্য কোনো ফায়সালা করেন।

দেশে ফিরে পিতার নিকটে তারা বিন ইয়ামিনকে রেখে আসার কারণ ব্যাখ্যা করে এবং সেই সাথে তারা নিজেদের কথার সত্যতা প্রমাণের জন্য মিসর প্রত্যাগত অন্যান্য কাফিলাকে সাক্ষী মানলো এবং পিতাকে বলল, وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُون '(হে পিতা!) আপনি জিজ্ঞেস করুন ঐ জনপদের লোকদের, যেখানে আমরা ছিলাম এবং (জিজ্ঞেস করুন) ঐসব কাফিলাকে যাদের সাথে আমরা এসেছি। আমরা নিশ্চিতভাবেই (আপনাকে) সত্য ঘটনা বলছি।'। (ইউসুফ ৮২)

কিন্তু ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত পিতা তাদের কথায় কর্ণপাত না করে বললেন,

بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ عَسَى اللهُ أَن يَّأْتِيَنِيْ بِهِمْ جَمِيْعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ

‘বরং তোমরা মনগড়া একটা কথা নিয়েই এসেছো। এখন সবর করাই উত্তম। সম্ভবত আল্লাহ তাদের সবাইকে (ইউসুফ ও বিন ইয়ামিনকে) একসঙ্গে আমার কাছে নিয়ে আসবেন। তিনি বিজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।’ (ইউসুফ-৮৩)

অতঃপর তিনি তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন, হায় আফসোস ইউসুফের জন্য! (আল্লাহ বলেন) এভাবে দুঃখে তাঁর চক্ষুদ্বয় সাদা হয়ে গেল এবং অসহনীয় মনস্তাপে তিনি ছিলেন ক্লিষ্ট। ছেলেরা তখন তাঁকে বলতে লাগল, ‘আল্লাহর কসম! আপনি তো শুধু ইউসুফের কথায় স্মরণ করে যাচ্ছেন। অবস্থা এখন এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, তাঁর শোকে আপনি নিজেকে দিশেহারা করে ফেলবেন অথবা নিজেকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিবেন।’

অতঃপর ইয়াকুব (আ.) বললেন,

إِنَّمَا أَشْكُوْ بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ، يَا بَنِيَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيْهِ وَلاَ تَيْأَسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللهِ إِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِنْ رَّوْحِ اللهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُوْنَ

‘আমি তো আমার অস্থিরতা ও দুঃখ আল্লাহর কাছেই পেশ করছি এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি যা জানি, তোমরা তা জানো না। হে বৎসগণ! যাও ইউসুফ ও তার ভাইকে তালাশ করো এবং আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহর রহমত থেকে কাফির সম্প্রদায় ব্যতীত কেউ নিরাশ হয় না।’ (ইউসুফ ১২/৮২-৮৭)

পিতার নির্দেশে ছেলেদের পুনরায় মিসরে গমন ইউসুফ ও বিন ইয়ামিনকে খুঁজে বের করার জন্য ইয়াকুব (আ.) ছেলেদেরকে এরূপ কঠোর নির্দেশ ইতিপূর্বে কখনো দেননি। তাঁর দৃঢ়তায় ছেলেদের মধ্যেও আশার সঞ্চার হলো। বিন ইয়ামিনের মিসরে থাকার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু ইউসুফ (আ.)-এর ব্যাপারে তাদের কোনো আশা ছিল না।

ইউসুফ (আ.)-এর সৎ ভাইয়েরা পিতার নির্দেশক্রমে মিসর পৌঁছালো এবং ইউসুফ (আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করল। তারা তাঁর কাছে নিজেদের সাংসারিক অভাব-অনটনের কথা পেশ করল। এমনকি পণ্যমূল্য আনার মত সঙ্গতিও তাদের নেই বলে জানালো। তদুপরি পরপর দুই পুত্রকে হারিয়ে অতিবৃদ্ধ পিতার করুণ অবস্থার কথাও জানালো।

এই পর্যায়ে ইউসুফ (আ.) আর নিজেকে ধরে রাখতে না পেরে বলে উঠলেন, 'তোমাদের কি মনে আছে, যা তোমরা করেছিলে ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে? যখন তোমরা (পরিণাম সম্পর্কে) অজ্ঞ ছিলে।'

মিশরের এই মহান মন্ত্রীর মুখ থেকে এ কথা বের হওয়া মাত্রই যেন চারিদিক কেঁপে উঠতে লাগলো। ইয়াকুব (আ.)-এর ছেলেরা মুখ হা করে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন। যে কথা সেই ভাইদের ব্যতীত আর কারো জানা ছিল না, সে কথা এক মহিমান্বিত মন্ত্রী জানলেন কীভাবে? তারা বলে উঠলো, তবে কি তুমিই ইউসুফ? ইউসুফ (আ.) বললেন, আমিই ইউসুফ আর বিন ইয়ামিনের দিকে ইশারা করে বললেন, আর ও আমার ভাই। নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি তাক্বওয়া অবলম্বন করে ও সবর করে, আল্লাহ তাদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না। ইউসুফ (আ.) এর ভাইয়েরা আবেগাপ্লুত হয়ে বলে উঠলো, আল্লাহর কসম ইউসুফ, আল্লাহ তোমাকে আমাদের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যথার্থই আমরা অপরাধী ছিলাম। ইউসুফ বললেন, لاَ تَثْرَيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ 'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। তিনি সকল দয়ালুর চাইতে অধিক দয়ালু।' (ইউসুফ ১২/৮৯-৯২)

এরপর তিনি তাঁর ব্যবহৃত একটি জামা ভাইদের হাতে দিয়ে বললেন, এই জামাটি নিয়ে পিতার চেহারার উপরে রেখো। তাতেই তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। অতঃপর তাঁকে সহ তোমাদের সকলের পরিবারবর্গকে নিয়ে এখানে চলে এসো। তাঁর ভাইয়েরা যখন মিশর থেকে মাত্র রওনা দিল, সেই মুহূর্ত থেকে ইয়াকুব (আ.) সুদূর ফিলিস্তিনে বসেই বলতে লাগলেন,আমি ইউসুফের গন্ধ পাচ্ছি। নিঃসন্দেহে এটি ছিল একটি মু'জিযা, যা আল্লাহ যথাসময়ে ইয়াকুব (আ.)-কে প্রদর্শন করেছেন।

যথাসময়ে কাফিলা দীর্ঘ সফর শেষে বাড়িতে পৌঁছালো এবং ভাইয়েরা ছুটে গিয়ে পিতাকে ইউসুফ (আ.)-এর সুসংবাদ দিল। অতঃপর তাঁর প্রদত্ত জামা পিতার মুখের উপরে রাখলে আল্লাহর ইচ্ছায় সাথে সাথে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে এলো। খুশিতে উদ্বেলিত ও আনন্দে উৎফুল্ল বৃদ্ধ পিতা বলে উঠলেন, 'আমি কি বলিনি যে, আল্লাহর নিকট থেকে আমি যা জানি, তোমরা তা জানো না'। অর্থাৎ ইউসুফ (আ.) জীবিত আছে এবং তার সাথে আমার সাক্ষাত হবে, এ খবর আল্লাহ আমাকে আগেই দিয়েছিলেন। প্রকৃত ঘটনা

সবার নিকটে পরিষ্কার হয়ে গেলে লজ্জিত ও অনুতপ্ত ভাইয়েরা সবাই এসে পিতার কাছে করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলো এবং আল্লাহর নিকটে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার অনুরোধ করলো। পিতা বললেন, অতিসত্বর আমি আমার পালনকর্তার নিকটে তোমাদের জন্য ক্ষমা চাইবো। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

এরপর তারা পুনরায় মিশরে যাত্রা শুরু করলেন। তবে এবার তাদের সাথে ছিলেন পিতা ইয়াকুব (আ.) ও তাঁর স্ত্রী। মিসরে তাদের এই যাওয়াটাই ছিল কেন'আন থেকে স্থায়ীভাবে তাদের মিসরে হিজরত। এর পরবর্তী ঘটনা হলো শৈশবে দেখা স্বপ্ন বাস্তবায়নের অনন্য দৃশ্য। এ বিষয়ে কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা উল্লেখ করেছেন,

فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَى يُوْسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوْا مِصْرَ إِنْ شَآءَ اللهُ آمِنِيْنَ- وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوْا لَهُ سُجَّداً وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيْلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّيْ حَقّاً وَقَدْ أَحْسَنَ بِيْ إِذْ أَخْرَجَنِيْ مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِيْ وَبَيْنَ إِخْوَتِيْ إِنَّ رَبِّيْ لَطِيفٌ لِّمَا يَشَآءُ، إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ

'অতঃপর যখন তারা ইউসুফের কাছে পৌঁছালো, তখন ইউসুফ পিতা-মাতাকে নিজের কাছে নিল এবং বলল, আল্লাহ চাহেন তো নিঃশংকচিত্তে মিসরে প্রবেশ করুন। অতঃপর সে তাঁর পিতা-মাতাকে সিংহাসনে বসালো এবং তারা সবাই তার সম্মুখে সিজদাবনত হলো। সে বলল, হে পিতা! এটিই হচ্ছে আমার ইতিপূর্বে দেখা স্বপ্নের ব্যাখ্যা। আমার পালনকর্তা একে বাস্তবে রূপায়িত করেছেন। তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আমাকে জেল থেকে বের করেছেন এবং আপনাদেরকে গ্রাম থেকে নিয়ে এসেছেন, শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করে দেওয়ার পর। আমার পালনকর্তা যা চান, সূক্ষ্ম কৌশলে তা সম্পন্ন করেন। নিশ্চয়ই তিনি বিজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।' (ইউসুফ ১২/৯৯-১০০)

দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর পিতা-পুত্রের মিলনের সময় ইউসুফ (আ.)-এর কথাগুলি লক্ষণীয়। তিনি এখানে ভাইদের দ্বারা অন্ধকূপে নিক্ষেপের কথা এবং পরবর্তীতে যুলায়খার চক্রান্তে কারাগারে নিক্ষেপের কথা চেপে গিয়ে কেবল কারামুক্তি থেকে বক্তব্য শুরু করেছেন। তারপর পিতাকে গ্রাম থেকে শহরে এনে মিলনের কথা ও উন্নত জীবনে পদার্পণের কথা বলেছেন। অতঃপর ভাইদের হিংসা ও চক্রান্তের দোষটি শয়তানের

উপরে চাপিয়ে দিয়ে ভাইদেরকে বাঁচিয়ে নিয়েছেন। সবকিছুতে আল্লাহর অনুগ্রহের স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। নিঃসন্দেহে এটি একটি উচ্চাঙ্গের বর্ণনা এবং এতে মহানুভব ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

এভাবে ইউসুফ (আ.)-এর শৈশবকালীন স্বপ্ন যখন স্বার্থক হলো, তখন তিনি কৃতজ্ঞ চিত্তে আল্লাহর নিকটে প্রাণভরে দু'আ করেন নিম্নোক্ত ভাষায়-

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِيْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِيْ مِنْ تَأْوِيْلِ الأَحَادِيْثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّيْ فِي الدُّنُيَا وَالآخِرَةِ تَوَفَّنِيْ مُسْلِماً وَّأَلْحِقْنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ

‘হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে রাষ্ট্রক্ষমতা দান করেছেন এবং আমাকে (স্বপ্নব্যাখ্যা সহ) বাণীসমূহের নিগুঢ় তত্ত্ব ব্যাখ্যা দানের শিক্ষা প্রদান করেছেন। নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের হে সৃষ্টিকর্তা! আপনিই আমার কার্যনির্বাহী দুনিয়া ও আখেরাতে। আপনি আমাকে ‘মুসলিম’ হিসেবে মৃত্যু দান করুন এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের সাথে মিলিত করুন।’ (ইউসুফ ১২/১০১)

সেই থেকে ইয়াকুব (আ.) তাঁর ছেলে ইউসুফের সাথে মিশরে বাস করতে লাগলো এবং তাদের বংশধরদেরই বলা হত বনী ইসরাঈল; যারা তখনই মিশরে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হলো। বাকিটা জীবন ইয়াকুব (আ.) তাঁর সন্তানদের নিয়ে আল্লাহর নিয়ামতের ছায়ায় কাটিয়ে দিলেন।

আইয়ুব (আ'লাইহিস সালাম)

ইবনু কাছীরের বর্ণনা অনুযায়ী, আইয়ুব (আ.) ছিলেন ইসহাক্ব (আ.)-এর দুই যমজ পুত্র ঈছ ও ইয়াকুবের মধ্যেকার প্রথম পুত্র ঈছ-এর প্রপৌত্র। আর তাঁর স্ত্রী ছিলেন ইয়াকুব পুত্র ইউসুফ (আ.)-এর পৌত্রী।

হযরত আইয়ুব (আ.) ছিলেন সবরকারী নবীগণের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় এবং অনন্য দৃষ্টান্ত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কুরআনে আইয়ুব (আ.)-এর নাম উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তিনি তাঁর কওমের নিকট দাওয়াত সম্পর্কে কোনো কথা আলোচনা করেননি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আইয়ুব (আ.)-এর সবরের কাহিনী আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। কুরআনে তিনি বলেন,

اِنَّا وَجَدۡنٰهُ صَابِرًا ؕ نِعۡمَ الۡعَبۡدُ ؕ اِنَّهٗۤ اَوَّاب ٌ

“নিশ্চয়ই আমি তাঁকে ধৈর্যশীল পেয়েছি। সে কতই না উত্তম বান্দা! নিশ্চয়ই সে ছিল আমার অভিমুখী।” (সূরা ছ্বদ ৩৮/৪৪)

আমরা জানি, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার প্রত্যেক নবীকেই কঠিন পরীক্ষাসমূহ দিতে হয়েছে। তারা সকলেই সে সব পরীক্ষায় সবর করেছেন ও উত্তীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু আইয়ুব (আ.)-এর আলোচনায় বিশেষ ভাবে ‘আমরা তাকে সবরকারী হিসেবে পেলাম’ (ছ্বদ ৪৪) বলার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বাস্তবেই তাঁকে কঠিনতম কোনো পরীক্ষার সম্মুখীন করেছিলেন। সূরা আম্বিয়া ও সূরা ছ্বদের দু’স্থানেই আইয়ুব (আ.)-এর আলোচনার শুরুতে আল্লাহর নিকটে তাঁর আহবানের কথা উল্লেখ হয়েছে। তাতে ইঙ্গিত রয়েছে তিনি নিঃসন্দেহে কঠিন বিপদে পড়েছিলেন। তাই তিনি আকুতিভরে আল্লাহকে ডেকেছিলেন। বিপদে পড়ে আল্লাহকে ডাকা ও তার নিকটে বিপদ মুক্তির জন্য প্রার্থনা করা অনুগত বান্দার কর্তব্য। তিনি বিপদে ধৈর্য হারিয়ে এটা করেননি, বরং বিপদ দূর করে দেবার জন্য আল্লাহর নিকটে দু'আ করেছিলেন। কি ছিল আইয়ুব (আ.)-এর সেই দুঃখ-কষ্ট? ইবন আব্বাস (রা.) বলেছেন, সাইয়্যিদিনা আইয়ুব (আ.) অত্যন্ত বিত্তশালী, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী একজন ব্যক্তি ছিলেন এবং একই সাথে তাঁর পরিবারের সদস্য সংখ্যাও ছিল অনেক। অর্থাৎ স্বাস্থ্য, সম্পদ এবং পরিবার এসব কিছুই তাঁর ছিল। এরপর একসময় হঠাৎ করে তিনি একসাথে এই সবকিছু হারিয়ে ফেলেন। অর্থাৎ একজন মানুষ এই দুনিয়াতে যা কিছুকে ভালোবাসেন, সাইয়্যিদিনা আইয়ুব (আ.) সেই সবকিছু হারিয়ে ফেললেন।

এই কথাটি নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, আইয়ুব (আ.) কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তবে সেই অসুস্থতা ঠিক কেমন ছিল, তা নিয়ে সরাসরি কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। আইয়ুব (আ.) পরীক্ষায় পড়েছেন সেটাও স্পষ্ট এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন সেটাও স্পষ্ট। তবে তা ঠিক কেমন পরীক্ষা ছিল এ ব্যাপারে কুরআন বা হাদীসে সরাসরি কোনো বক্তব্য বা ইঙ্গিত নেই। এ সম্পর্কে অনেক ইসরাঈলী বর্ণনা আছে, যেগুলোর সত্য-মিথ্যা সম্পর্কে আল্লাহই ভালো জানেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ এই ইসরাঈলী বর্ণনাগুলো সম্পর্কে বলেছেন, ‘তোমরা সেগুলোকে বর্ণনা করতে পারো। কিন্তু সেগুলোকে মিথ্যাও বলবে না, আবার সত্যও বলবে না।’ (সহীহ বুখারী ৩৪৬১)

ইসরাঈলী বর্ণনা অনুযায়ী, আইয়ুব (আ.)-এর স্বাস্থ্যের অবস্থা এতটাই খারাপ হয়ে গেছিলো যে, তিনি কোনো কাজ করতে পারতেন না; নড়াচড়াও করতে পারতেন না। সেই রোগ দেহের ভিতরের অংশ এবং একইসাথে দেহের বাইরের অংশ থেকেও তাঁকে আক্রান্ত করেছিল। কাজেই আইয়ুব (আ.) এমন একটি রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন, যা বাইরে থেকে দেখলেও বোঝা যেত। এই রোগ বিষয়ে, সেই সমাজের লোকেদের মধ্যে কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। তারা এই রোগাক্রান্ত হওয়াকে এক ধরনের অশুভ লক্ষণ হিসেবে বিবেচনা করত এবং এই রোগকে ঘৃণা করত। এমনকি কেউ এই রোগে আক্রান্ত হলে নিজেকে তার থেকে পৃথক করে নিত। ফলে আইয়ুব (আ.) সেই সমাজে একঘরে হয়ে পড়লেন। কিছু কিছু বর্ণনায় বলা হয়ে থাকে যে, লোকেরা তাঁকে তাঁর গ্রাম থেকে বের করে দিয়েছিল। ফলে আইয়ুব (আ.)-কে গ্রামের বাইরে একটি অঞ্চলে বসবাস করতে হচ্ছিলো এবং তাঁর আয়-রোজগারের কোনো উৎস ছিল না, সম্পদ ছিল না। এ সময় শুধুমাত্র তাঁর একজন স্ত্রী ব্যতীত তাঁর সাথে আর কেউ ছিল না। সুতরাং সমস্ত দিক থেকে তাঁর অবস্থা চূড়ান্ত খারাপের দিকে যাচ্ছিলো এবং এই দুর্দশা স্বল্প কয়েকদিনের বিষয় ছিল না। বরং তা চলেছে বছরের পর বছর। বলা হয়ে থাকে, এমনকি তাঁর নিকটাত্মীয়রা তাঁকে বলতে শুরু করল যে, যদি আল্লাহ তাঁকে ভালোবাসতেন তাহলে তো তাঁর অবস্থা এরকম হত না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার একজন সম্মানিত নবীর পক্ষে এরকম কথা শোনা অসুখে আক্রান্ত হওয়ার থেকেও বেশি পীড়াদায়ক ছিল। দুনিয়াবি বিপদের প্রতি দুনিয়ার লোকেদের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, যখন কোনো ব্যক্তি কঠিন পরীক্ষায় পড়ে, তখন তারা বলতে শুরু করে যে তোমার রব তোমাকে পরিত্যাগ করেছেন। কিন্তু আমরা দেখতে পাই, আইয়ুব (আ.)-এর এই কঠিন পরীক্ষা যখন সমাপ্ত হলো এবং তিনি সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তাঁকে শুধুমাত্র তাঁর হারানো নিয়ামতগুলোয় ফিরিয়ে দেননি; বরং তা আরও দ্বিগুণ করে ফিরিয়ে দিলেন। কাজেই ফলাফল দেখে বোঝা যাচ্ছে, সেই কঠিন পরীক্ষা কোনো অভিশাপ বা শাস্তি ছিল না। একজন মু'মিন ব্যক্তির জন্য সব অবস্থায় কল্যাণকর। আইয়ুব (আ.) খুব ভালো করেই জানতেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তাঁকে কষ্ট দিচ্ছেন না, বরং তিনি তাঁর পরীক্ষা নিচ্ছেন আরও ভালো কিছু দেয়ার জন্য। এজন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করার মুহূর্তে এই কষ্ট আর যন্ত্রণাকে তিনি শয়তানের ধোঁকা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এ সম্পর্কে কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলছেন,

وَ اذۡكُرۡ عَبۡدَنَاۤ اَیُّوۡبَ ۘ اِذۡ نَادٰی رَبَّهٗۤ اَنِّیۡ مَسَّنِیَ الشَّیۡطٰنُ بِنُصۡبٍ وَّ عَذَابٍ ؕ
'আর স্মরণ কর আমার বান্দা আইয়ুবকে, যখন সে তার রবকে ডেকে বলেছিল, শয়তান তো আমাকে কষ্ট ও আযাবের ছোঁয়া দিয়েছে।' (ছুদ ৩৮/৪১)

অর্থাৎ শয়তান আইয়ুব (আ.)-এর ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়ে আল্লাহর অকৃতজ্ঞ বান্দাহ বানানোর জন্য তাঁকে অবিরাম কুমন্ত্রণা দিতে থাকতো। অতঃপর তিনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার কাছে দু'আ করেন। কুরআনের ভাষায়,
وَ اَیُّوۡبَ اِذۡ نَادٰی رَبَّهٗۤ اَنِّیۡ مَسَّنِیَ الضُّرُّ وَ اَنۡتَ اَرۡحَمُ الرّٰحِمِیۡنَ
'আর স্মরণ কর আইয়ুবের কথা, যখন সে তার রবকে আহবান করে বলেছিল, আমি দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়েছি। আর আপনি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।' (২১:৮৩)

আইয়ুব (আ.)-এর দু'আর জবাবে আল্লাহ বলেন,
فاستجبنا لهٗ فكشفنا ما بهٖ من ضر و اتينه اهله ۘ
'তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম। আর তার যত দুঃখ-কষ্ট ছিল তা দূর করে দিলাম এবং তার পরিবার-পরিজন তাকে দিয়ে দিলাম।' (২১:৮৪)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা সাইয়্যিদিনা আইয়ুব (আ.)-এর দু'আকে কবুল করলেন। আইয়ুব (আ.) তার প্রাকৃতিক কাজ সারতে বের হতেন এবং কাজ সারার পর তাঁর স্ত্রী তাঁর হাত ধরে নিয়ে আসতেন। একদিন তিনি তাঁর প্রাকৃতিক কাজ সারার পর তার স্ত্রীর কাছে ফিরতে দেরি করছিলেন এমন সময় আল্লাহ্ তা'আলা আইয়ুব (আ.)-এর কাছে ওহী পাঠালেন যে, "আপনি আপনার পা দ্বারা জমিনে আঘাত করুন, এই তো গোসলের সুশীতল পানি ও পানীয়।" [সূরা ছ্বদ: ৪২]

আইয়ুব (আ.) জমিনে আঘাত করার সাথে সাথেই জমিন থেকে ঝর্না বের হয়ে আসলো। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তাঁকে জমিন থেকে বের হওয়া এই পানিতে গোসল করার আদেশ দিলেন। ফলে এটা তাঁকে বিশুদ্ধ করল, তিনি বাহ্যিকভাবে আরোগ্য লাভ করলেন। এরপর এই পানি তিনি পান করলেন। ফলে দেহের ভিতরের দিক থেকেও তিনি আরোগ্য লাভ করলেন। সাইয়্যিদিনা আইয়ুব (আ.) তাঁর হারানো সুস্বাস্থ্যকে ফিরে পেলেন।

আইয়ুব (আ.)-এর দুটি উঠান ছিল। একটি গম শুকানোর অপরটি যব শুকানোর। আল্লাহ্ তা'আলা সে দু'টির উপর দুখণ্ড মেঘ পাঠালেন। এক খণ্ড মেঘ সে গমের উঠানে এমনভাবে স্বর্ণ ফেললো যে, সেটি পূর্ণ হয়ে গেল। অপর মেঘ খণ্ডটি সেটির উপর এমনভাবে রৌপ্য বর্ষণ করল যে, সেটাও পূর্ণ হয়ে গেল। [সহীহ ইবন হিব্বান: ৭/১৫৭, হাদীস নং ২৮৯৮, মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৬৩৫, ৪১১৫]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, একবার আইয়ুব (আ.) গোসল করছিলেন, এমতাবস্থায় এক ঝাক স্বর্ণের ফড়িং তাঁর উপর পড়তে আরম্ভ করল, তিনি সেগুলো মুঠি মুঠি তার কাপড়ে জমা করছিলেন। তখন তাঁর রব তাঁকে ডেকে বললেন, ‘হে আইয়ুব, আমি কি আপনাকে যা দেখছেন তা থেকেও বেশি প্রদান করে ধনী করে দেইনি?’ উত্তরে আইয়ুব (আ.) বললেন, অবশ্যই হে আমার রব! তবে আপনার দেয়া বরকত থেকে আমি কখনো অমুখাপেক্ষী হবো না। [বুখারী: ৩৩৯১, ২৭৯]
এ ছাড়া আইয়ুব (আ.) সংক্রান্ত আরও কিছু কাহিনী বিভিন্ন ঐতিহাসিক বর্ণনাসমূহে এসেছে, কিন্তু সেগুলো খুব বেশি গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি বিধায় এখানে উল্লেখ করা গেল না।

কথিত আছে যে, আঠারো বছর দীর্ঘ পরীক্ষার পর তিনি আল্লাহর সমীপে প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন এবং সুস্থতার সাথে সাথে ধন-দৌলত ও সন্তানাদি দ্বিগুণ দান করলেন। বিপদে আপত্তি, অভিযোগ ও অনুযোগ করা এবং ক্ষোভ ও হতাশা প্রকাশ করা ধৈর্যের পরিপন্থী। আর এ সকল কাজ আইয়ুব (আ.) কখনও করেননি। অবশ্য মুক্তি প্রার্থনা ধৈর্যের পরিপন্থী নয়। সেই কারণে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য ‘‘আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম’’ শব্দ ব্যবহার করেছেন।

শু’আইব (আ'লাইহিস সালাম)

প্রতিটি নবীকেই কোনো না কোনো জাতিকে তাওহীদের বাণী প্রচার করতে হয়েছে। যার ফলে তারা সকলেই দক্ষ বক্তা ছিলেন। তবে ব্যতিক্রম বলতে আমরা মূসা (আ.) এর কথা উল্লেখ করতে পারি; যার বাকশক্তি বিশেষ স্পষ্ট ছিল না। কিন্তু তাকে জন্য

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তাঁর সাথে তাঁর ভাই হারুন (আ.)-কে পাঠিয়েছিলেন। অনেক উলামাদের মতে, মূসা (আ.) জিহবার জড়তা মুক্তির জন্য দু'আ করলে তা কবুল হয়েছিল। শু'আইব (আ.)-কে বলা হত ‘খতিবুল আম্বিয়া’ তথা নবীদের বক্তা। তাঁর শব্দচয়ন ছিল সকল নবীদের চেয়ে স্পষ্ট এবং তাঁর কথার প্রভাব ছিল গভীর। পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত নবীদের মধ্যে ৪ জন ছিলেন আরব জাতির এবং খতিবুল আম্বিয়া তথা শু'আইব (আ.) ছিলেন তাদেরই একজন।

হূদ ও সালিহ (আ'লাইহিমাস সালাম) এর পর শু'আইব (আ.) ছিলেন তৃতীয় আরব নবী, যাদের কথা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কুরআনে উল্লেখ করেছেন। শু'আইব (আ.)-কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা প্রেরণ করেছিলেন মাদইয়ান শহরে; যা ছিল নির্মূল হয়ে যাওয়া সামূদ জাতির শহরের কাছেই। তিনি হূদ ও সালিহ (আ'লাইহিমাস সালাম)-এর অনেক পরে এসেছিলেন। তবে তিনি ঠিক কোন নবীর পর এসেছিলেন তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তিনি ছিলেন ইবরাহীম (আ.) এর বংশধর। শু'আইব (আ.) এর দাওয়াত সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কুরআনে বলেছেন,

وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ- وَلاَ تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجاً وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلاً فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ- وَإِنْ كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَآئِفَةٌ لَّمْ يْؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ

"আমি মাদইয়ানের প্রতি তাদের ভাই শু‘আইবকে প্রেরণ করেছিলাম। সে তাদের বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনো উপাস্য নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসে গেছে। অতএব তোমরা মাপ ও ওযন পূর্ণ কর। মানুষকে তাদের মালামাল কম দিয়ো না। ভূপৃষ্ঠে সংস্কার সাধনের পর তোমরা সেখানে অনর্থ সৃষ্টি করো না। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। ‘তোমরা পথে-ঘাটে এ কারণে বসে থেকো না যে, ঈমানদারদের হুমকি দেবে, আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করবে ও তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করবে। স্মরণ কর, যখন তোমরা সংখ্যায় অল্প ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তোমাদেরকে আধিক্য দান করেছেন এবং লক্ষ্য কর কিরূপ অশুভ পরিণতি হয়েছে অনর্থকারীদের। আর যদি তোমাদের একদল ঐ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে যা

নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি এবং আরেক দল বিশ্বাস স্থাপন না করে, তবে তোমরা অপেক্ষা কর যে পর্যন্ত না আল্লাহ আমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেন। কেননা তিনিই শ্রেষ্ঠ ফায়সালাকারী। (আ'রাফ ৭/৮৫-৮৭)

শু'আইব (আ.)-এর নিঃস্বার্থ ও আন্তরিকতাপূর্ণ দাওয়াত তাঁর উদ্ধত কওমের নেতাদের হৃদয়ে রেখাপাত করল না। তারা বরং আরও উদ্ধত হয়ে পূর্ববর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত কওমের পাপিষ্ঠ নেতাদের ন্যায় নবীকে প্রত্যাখ্যান করল এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও তাচ্ছিল্য করে বলল, أَصَلاَتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَآءُ إِنَّكَ لأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ- 'তোমার স্বলাত কি তোমাকে একথা শেখায় যে, আমরা আমাদের ঐসব উপাস্যের পূজা ছেড়ে দিই, আমাদের পূর্ব পুরুষেরা যুগ যুগ ধরে যেসবের পূজা করে আসছে? আর আমাদের ধন-সম্পদে ইচ্ছামত আমরা যা কিছু করে থাকি, তা পরিত্যাগ করি? তুমি তো একজন সহনশীল ও সৎ ব্যক্তি।' (হূদ ১১/৮৭) অর্থাৎ তুমি একজন জ্ঞানী, দূরদর্শী ও সাধু ব্যক্তি হয়ে একথা কিভাবে বলতে পার যে, আমরা আমাদের বাপ-দাদার আমল থেকে চলে আসা দেব-দেবীর পূজা প্রথাসমূহ পরিত্যাগ করি এবং আমাদের আয়-উপাদানে ও রূযী-রোজগারে ইচ্ছামত চলা ছেড়ে দেই। আয়-ব্যয়ে কোনটা হালাল কোনটা হারাম তা তোমার কাছ থেকে জেনে নিয়ে কাজ করতে হবে এটা কি কখনো সম্ভব হতে পারে? তাদের ধারণা মতে তাদের সকল কাজ চোখ বুঁজে সমর্থন করা ও তাতে বরকতের জন্য দু'আ করাই হলো সৎ ও ভালো মানুষদের কাজ। তারা ইবাদাত ও মু'আমালাতকে পরস্পরের প্রভাবমুক্ত ভেবেছিল। ইবাদত কবুলের জন্য যে রূযী হালাল হওয়া জরুরী, একথা তাদের বুঝে আসেনি। সেজন্য তারা ব্যবসা-বাণিজ্যে হালাল-হারামের বিধান মানতে রাজি ছিল না। যদিও স্বলাত আদায়ে কোন আপত্তি তাদের ছিল না। কেননা দেব-দেবীর পূজা সত্ত্বেও সৃষ্টিকর্তা হিসাবে এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও স্বীকৃতি সবারই ছিল (লুকমান ৩১/২৫)। তাদের আপত্তি ছিল কেবল একখানে যে, সবকিছু ছেড়ে কেবলমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে হবে এবং দুনিয়াবী ক্ষেত্রে আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হবে।

এরপর শু'আইব (আ.) মাদইয়ানবাসীদের স্মরণ করিয়ে দিলেন পূর্বেকার জাতির লোকেদের অবাধ্যতার পরিণতির কথা। পাশাপাশি তিনি তাদেরকে তাওবা-ইস্তিগফার করার জন্যও উৎসাহ দিয়েছিলেন। কুরআনের ভাষায়,

وَ يٰقَوۡمِ لَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شِقَاقِیۡۤ اَنۡ یُّصِیۡبَكُمۡ مِّثۡلُ مَاۤ اَصَابَ قَوۡمَ نُوۡحٍ اَوۡ قَوۡمَ هُوۡدٍ اَوۡ قَوۡمَ صٰلِحٍ ؕ وَ مَا قَوۡمُ لُوۡطٍ مِّنۡكُمۡ بِبَعِیۡدٍ- وَ اسۡتَغۡفِرُوۡا رَبَّكُمۡ ثُمَّ تُوۡبُوۡۤا اِلَیۡهِ ؕ اِنَّ رَبِّیۡ رَحِیۡمٌ وَّدُوۡدٌ

"হে আমার সম্প্রদায়! আমার সঙ্গে বিরোধ তোমাদেরকে যেন কিছুতেই এমন কাজে উদ্বুদ্ধ না করে যাতে তোমাদের উপর এমন বিপদ আসে যেমন বিপদ এসেছিল নূহের জাতির কিংবা হূদের জাতির কিংবা সালিহর জাতির উপর। আর লূতের জাতির অবস্থান তো তোমাদের থেকে মোটেই দূরে নয়। তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁরই নিকট তাওবাহ কর। আমার প্রতিপালক তো পরম দয়ালু, বড়ই ভালবাসা পোষণকারী।" (হূদ ১১/৮৯-৯০)

এরপর পূর্বের অবাধ্য জাতিদের মতো মাদইয়ানের লোকেরাও তাদের নবীকে অপবাদ দিতে শুরু করল। এমনকি পাথর মেরে হত্যার হুমকিও দিল। শু'আইব (আ.) যখন দেখলেন যে, এ সম্প্রদায় নিজ কুফরী ও শিরকের উপর অটল এবং তাদের উপর ওয়ায-নসীহতের কোন প্রভাব পড়ছে না, তখন তিনি তাদেরকে আল্লাহর জিম্মায় ছেড়ে দিলেন এবং তাদের উদ্দেশ্যে বললেন,

وَ یٰقَوۡمِ اعۡمَلُوۡا عَلٰی مَكَانَتِكُمۡ اِنِّیۡ عَامِلٌ ؕ سَوۡفَ تَعۡلَمُوۡنَ ۙ مَنۡ یَّاۡتِیۡهِ عَذَابٌ یُّخۡزِیۡهِ وَ مَنۡ هُوَ كَاذِبٌ ؕ وَ ارۡتَقِبُوۡۤا اِنِّیۡ مَعَكُمۡ رَقِیۡبٌ

"আর হে আমার কওম, তোমরা তোমাদের অবস্থানে কাজ করে যাও, আমিও কাজ করছি। অচিরেই তোমরা জানতে পারবে কার কাছে আসবে সে আযাব যা তাকে লাঞ্ছিত করবে এবং কে মিথ্যাবাদী। আর তোমরা অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষমান।" (হূদ ১১/৯৩)

অতঃপর তিনি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে বললেন, رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ- 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের ও আমাদের কওমের মধ্যে তুমি যথার্থ ফায়সালা করে দাও। আর তুমিই তো শ্রেষ্ঠ ফায়সালাকারী। তখন তার কওমের কাফির নেতারা বলল, وَقَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْباً إِنَّكُمْ إِذاً لَّخَاسِرُون- যদি তোমরা শু'আইবের অনুসরণ কর, তবে তোমরা নিশ্চিতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।' (আ'রাফ ৭/৮৯-৯০)

তারপর আল্লাহ তা'আলা তার চিরন্তন বিধান অনুসারে শু'আইব (আ.)-কে এবং তাঁর সঙ্গী-সাথী ঈমানদারগণকে উক্ত জনপদ হতে অন্যত্র নিরাপদে সরিয়ে নিলেন এবং জিবরীল (আ.) এক ভয়ঙ্কর হাঁকে অবশিষ্ট সবাই এক নিমিষে ধ্বংস হলো। আল্লাহ বলছেন,

وَ لَمَّا جَآءَ اَمۡرُنَا نَجَّیۡنَا شُعَیۡبًا وَّ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا مَعَهٗ بِرَحۡمَۃٍ مِّنَّا وَ اَخَذَتِ الَّذِیۡنَ ظَلَمُوا الصَّیۡحَۃُ فَاَصۡبَحُوۡا فِیۡ دِیَارِهِمۡ جٰثِمِیۡنَ

"আর যখন আমার আদেশ আসল, তখন শু'আইব ও তার সাথে যারা ঈমান এনেছে, তাদেরকে আমার পক্ষ থেকে রহমত দ্বারা নাজাত দিলাম এবং যারা যুলম করেছিল তাদেরকে পাকড়াও করল বিকট আওয়াজ। ফলে তারা নিজ নিজ গৃহে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকলো।" (হূদ ১১/৯৪)

সেই চিৎকার শুনে তাদের অন্তর ফেটে চুর চুর হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের মৃত্যু হয়ে গিয়েছিল। তার পরে পরেই ভূমিকম্পও আরম্ভ হয়েছিল। (আ'রাফ ৯১, আনকাবূত ৩৭)

মুসা ও হারুন (আ'লাইহিমাস সালাম)

আল কালীম মুসা (আ.), ফেরাউন এবং বনী ইসরাঈলের প্রসঙ্গ নিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কুরআনে ৪০ টিরও বেশি সূরায় আলোচনা করেছেন এবং সরাসরি মুসা (আ.)-এর নাম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা উল্লেখ করেছেন সর্বমোট ১৩৬ বার। এমনকি ফিরাউনের নাম উল্লেখ করেছেন ৭০ বারেরও বেশি। প্রায় সাড়ে পাঁচশত আয়াত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা নাযিল করেছেন মুসা, ফিরাউন এবং বনী ইসরাঈলের কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে। এ কারণে একজন আলিম মন্তব্য করে বলেছেন, "কুরআন যেন প্রায় মুসা (আ.)-এর কাহিনী হয়ে যাচ্ছিলো।"

মুসা (আ.) হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যাঁর নাম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কুরআনে সর্বাধিক বার উল্লেখ করেছেন এবং ফিরাউন হচ্ছে সেই ব্যক্তি যার নাম দ্বিতীয় সর্বাধিক বার কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। এমন কোনো নবী নেই যার কথা কুরআনে মুসা (আ.)-এর চেয়ে বেশি উল্লেখ করা হয়েছে; এমন কোনো কাহিনী নেই, যেটা বিস্তারের দিক থেকে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনার দিক থেকে মুসা (আ.)-এর কাহিনীর সমতুল্য। মূসা (আ.) ছিলেন শ্রেষ্ঠ পাঁচজন রাসূলদের মধ্যে একজন।

মুসা (আ.) ও ফিরাউনের ঘটনা কুরআনে বারবার উল্লেখ করার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো, এলাহী কিতাবধারী ইহুদী-নাসারাদের পিছনের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া এবং শেষনবীর উপরে ঈমান আনার পক্ষে যৌক্তিকতা উপস্থাপন করা।

ফিরাউন কোনো একক ব্যক্তির নাম নয়। ফিরাউন ছিল মিসরের ক্বিবতী বংশীয় শাসকদের উপাধি। ক্বিবতীরা ছিল মিসরের আদি বাসিন্দা। এক্ষণে তারা সম্রাট বংশের হওয়ায় শাম থেকে আগত সংখ্যালঘু সুখী-স্বচ্ছল বনী ইসরাঈলদের হিংসা করতে থাকে। ক্রমে তা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নির্যাতনের রূপ পরিগ্রহ করে। মিশরে একের পর এক ফিরাউনের নেতৃত্বে নানাবিধ স্থাপত্য ও দেবালয় নির্মাণের কাজ চলতে থাকে। কিন্তু বনী ইসরাঈলদের অবস্থানে কোনো পরিবর্তন আসে না, তারা সমাজে নির্যাতিত ও নিপীড়িত রয়ে যায়। এসময়ে রাজত্বের সাথে প্রভুত্বের মিশ্রণ ঘটানোর এক প্রচেষ্টা দেখা দেয়। এরই জের ধরে, মিশরের সিংহাসনে আসে এমন এক শাসক যে নিজেকে সবচেয়ে বড় প্রভু বলে দাবি করত। এই ফিরাউন মানব ইতিহাসের নিকৃষ্টতম ব্যক্তি।

সুদ্দী ও মুররাহ প্রমুখ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস ও আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা.) এবং বহু সংখ্যক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন যে, ফিরাউন একদা স্বপ্নে দেখেন যে, বায়তুল মুক্বাদ্দাস হতে একটি আগুন এসে মিসরের ঘর-বাড়ি ও মূল অধিবাসী ক্বিবতীদের জ্বালিয়ে দিচ্ছে। অথচ বনু ইসরাঈলদের কিছুই হচ্ছে না। ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় সে ঘুম থেকে জেগে উঠল। অতঃপর দেশের বড় বড় জ্যোতিষী ও জাদুকরদের সমবেত করল এবং তাদের সম্মুখে স্বপ্নের বৃত্তান্ত বর্ণনা দিল ও এর ব্যাখ্যা জানতে চাইল। জ্যোতিষীগণ বলল যে, অতিসত্বর বনী ইসরাঈলের মধ্যে একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, যার হাতে মিসরীয়দের ধ্বংস নেমে আসবে।' [কুরতুবী, ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/২২২ পৃঃ।]

মিসর সম্রাট ফিরাউন জ্যোতিষীদের মাধ্যমে এই ভবিষ্যদ্বাণী জানতে পেরে উক্ত সন্তানের জন্ম রোধের কৌশল হিসেবে সে বনু ইসরাঈলদের ঘরে নবজাত সকল পুত্র সন্তানকে ব্যাপকহারে হত্যার নির্দেশ দিল। উদ্দেশ্য ছিল, এভাবে হত্যা করতে থাকলে এক সময় বনু ইসরাঈল কওম যুবক শূন্য হয়ে যাবে, বৃদ্ধরাও মারা যাবে এবং মহিলারা সব দাসীবৃত্তিতে বাধ্য হবে। যখনই কোনো নারী গর্ভবতী হত, তখনই তাকে কড়া

নজরদারিতে রাখা হত এবং বাচ্চার জন্ম হলে বাচ্চাটিকে হত্যা করা হত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা অত্যাচারী ফিরাউন সম্পর্কে কুরআনে বলছেন,

اِنَّ فِرۡعَوۡنَ عَلَا فِی الۡاَرۡضِ وَ جَعَلَ اَهۡلَهَا شِیَعًا یَّسۡتَضۡعِفُ طَآئِفَۃً مِّنۡهُمۡ یُذَبِّحُ اَبۡنَآءَهُمۡ وَ یَسۡتَحۡیٖ نِسَآءَهُمۡ ؕ اِنَّهٗ کَانَ مِنَ الۡمُفۡسِدِیۡنَ

‘নিশ্চয় ফির‘আউন (মিশর) দেশে উদ্ধত হয়েছিল এবং তার অধিবাসীকে নানা দলে বিভক্ত করেছিল। তাদের একদলকে সে দুর্বল করে রেখেছিল, যাদের পুত্রদেরকে সে হত্যা করত আর কন্যাদেরকে বাঁচিয়ে রাখত। নিশ্চয় সে ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অন্যতম।’ (২৮:০৪)

ইবনু কাছীর বলেন, একাধিক মুফাসসির বলেছেন যে, শাসকদল ক্বিবতীরা ফিরাউনের কাছে গিয়ে অভিযোগ করল যে, এভাবে পুত্র সন্তান হত্যা করায় বনু ইসরাঈলের কর্মজীবী ও শ্রমিক শ্রেণীর ঘাটতি হচ্ছে। যাতে তাদের কর্মী সংকট দেখা দিয়েছে। তখন ফিরাউন এক বছর অন্তর অন্তর পুত্র হত্যার নির্দেশ দেয়। এতে বাদ পড়া বছরে হারুনের জন্ম হয়। কিন্তু হত্যার বছরে মূসার জন্ম হয়। ফলে পিতা-মাতা তাদের নবজাত সন্তানের নিশ্চিত হত্যার আশংকায় ভীত হয়ে পড়লেন। এমতাবস্থায় আল্লাহ মূসা (আ.)-এর মায়ের অন্তরে ইলহাম করে বলেন,

وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيْهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيْهِ فِي الْيَمِّ وَلاَ تَخَافِي وَلاَ تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ

‘আমরা মূসার মায়ের কাছে প্রত্যাদেশ করলাম এই মর্মে যে, তুমি ছেলেকে দুধ পান করাও। অতঃপর তার জীবনের ব্যাপারে যখন শংকিত হবে, তখন তাকে নদীতে নিক্ষেপ করবে। তুমি ভীত হয়ো না ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ো না। আমরা ওকে তোমার কাছেই ফিরিয়ে দেব এবং ওকে নবীদের অন্তর্ভুক্ত করব’ (ক্বসস ২৮/৭)। মূলত শেষের দু’টি ওয়াদাই তাঁর মাকে নিশ্চিন্ত ও উদ্বুদ্ধ করে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা পরবর্তীতে মূসা (আ.)-কে বলেন,

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى- إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى- أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي

‘আমরা তোমার উপর আরো একবার অনুগ্রহ করেছিলাম। যখন আমরা তোমার মাকে প্রত্যাদেশ করেছিলাম, যা প্রত্যাদেশ করা হয়। (এই মর্মে যে,) তোমার নবজাতক সন্তানকে সিন্দুকে ভরে নদীতে ভাসিয়ে দাও। অতঃপর নদী তাকে তীরে ঠেলে দেবে।

অতঃপর আমার শত্রু ও তার শত্রু (ফিরাউন) তাকে উঠিয়ে নেবে এবং আমি তোমার উপর আমার পক্ষ হতে বিশেষ মহাব্বত নিক্ষেপ করেছিলাম এবং তা এজন্য যে, তুমি আমার চোখের সামনে প্রতিপালিত হও।' (ত্বহা ২০/৩৭-৩৯)

ফিরাউনের সৈন্যদের হাতে নিহত হবার নিশ্চিত সম্ভাবনা দেখে আল্লাহর প্রত্যাদেশ অনুযায়ী মুসা (আ.)-এর পিতা-মাতা তাদের প্রাণাধিক প্রিয় সন্তানকে সিন্দুকে ভরে নীল নদে ভাসিয়ে দিলেন। অতঃপর স্রোতের সাথে সাথে সিন্দুকটি এগিয়ে চলল। ওদিকে মূসার (বড়) বোন তার মায়ের হুকুমে (ক্বসস ২৮/১১) সিন্দুকটিকে অনুসরণ করে নদীর কিনারা দিয়ে চলতে লাগল (ত্বহা ২০/৪০)। এক সময় তা আল্লাহর ইচ্ছায় ফিরাউনের প্রাসাদের ঘাটে এসে ভিড়ল। ফিরাউনের পুণ্যবতী স্ত্রী আসিয়া ফুটফুটে সুন্দর বাচ্চাটিকে দেখে অভিভূত হয়ে পড়লেন। ফিরাউন তাকে বনু ইসরাঈল সন্তান ভেবে হত্যা করতে চাইলো। কিন্তু সন্তানহীনা স্ত্রীর অপত্য স্নেহের কারণে তা সম্ভব হয়নি। অবশেষে ফিরাউন নিজে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। কারণ আল্লাহ মূসার চেহারার মধ্যে বিশেষ একটা মায়াময় কমনীয়তা দান করেছিলেন (ত্বহা ২০/৩৯)। ফিরাউনের হৃদয়ের পাষন্ডতা গলতে সেটুকুই যথেষ্ট ছিল। বস্তুত এটাও ছিল আল্লাহর মহা পরিকল্পনারই অংশ বিশেষ। ফুটফুটে শিশুটিকে দেখে ফিরাউনের স্ত্রী তার স্বামীকে বললেন,

وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لاَ تَقْتُلُوهُ عَسَى أَن يَّنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُوْنَ

'এ শিশু আমার ও তোমার চোখের প্রশান্তি। একে হত্যা করো না। এ আমাদের উপকারে আসতে পারে অথবা আমরা তাকে পুত্র করে নিতে পারি'। আল্লাহ বলেন, 'অথচ তারা (আমার কৌশল) বুঝতে পারল না' (ক্বসস ২৮/৯)। মূসা এক্ষণে ফিরাউনের স্ত্রীর কোলে পুত্রস্নেহ পেতে শুরু করলেন। অতঃপর বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানোর জন্য রাণীর নির্দেশে বাজারে বহু ধাত্রীর কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। কিন্তু মুসা কারোর বুকে মুখ দিচ্ছেন না। আল্লাহ বলেন, وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ 'আমরা পূর্ব থেকেই অন্যের দুধ খাওয়া থেকে মুসাকে বিরত রেখেছিলাম' (ক্বসস ২৮/১২)। এমন সময় অপেক্ষারত মুসার বোন বলল, আমি কি আপনাদেরকে এমন এক পরিবারের খবর দিব, যারা আপনাদের জন্য এ শিশু পুত্রের লালন-পালন করবে এবং তারা এর শুভাকাঙ্ক্ষী? (ক্বসস ২৮/১২)। রাণীর সম্মতিক্রমে মূসার মাকেই

প্রস্তাবিত ধাত্রীগৃহে প্রেরণ করা হলো। মুসা খুশি মনে মায়ের দুধ গ্রহণ করলেন এবং নিজ মায়ের আদর-যত্নেই বেড়ে উঠতে লাগলেন। এভাবেই ফিরাউনি কৌশলের উপরে আল্লাহর কৌশল বিজয়ী হলো।

সাইয়্যিদিনা মুসা (আ.) শৈশব পেরিয়ে কৈশোর এবং কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পদার্পণ করলেন। যে বয়সে রাজপুত্ররা আয়েশে জীবন পার করতে ব্যস্ত থাকে, সে বয়সে মুসা (আ.) রাজপ্রাসাদ থেকে বের হয়ে শহরের মানুষদের বিভিন্ন উপকার করার কাজে ব্যস্ত থাকতেন। এমনই একদিন তিনি শহরের রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় দেখলেন, একজন মিশরীয় লোক অন্যায়ভাবে একজন বনী ইসরাঈলের সাথে প্রহার করছে। মুসা (আ.) তাকে থামানোর চেষ্টা করতে থাকেন। এভাবেই প্রাথমিক ধস্তাধস্তির এক পর্যায়ে মুসা (আ.) মিশরীয় ব্যক্তিটিকে থামিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে ঘুষি বসিয়ে দিলেন। তাকে হত্যা করা মুসা (আ.)-এর উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু মুসা (আ.)-এর এক ঘুষির আঘাতেই লোকটি সেখানেই মৃত্যুবরণ করল। অনাকাঙ্ক্ষিত ও আকস্মিক হত্যাকাণ্ডের আসামী হয়ে জীবনের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত্র মুসা ফিরাউনের রাজ্যসীমা ছেড়ে পার্শ্ববর্তী রাজ্য মাদইয়ানে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

মাদইয়ানে প্রবেশ করে তিনি পানির আশায় একটি কূপের দিকে গেলেন। সেখানে পানি প্রার্থী লোকদের ভিড়ের অদূরে দু'টি মেয়েকে তাদের তৃষ্ণার্ত পশুগুলি সহ অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাঁর হৃদয় উথলে উঠলো। কেউ তাদের দিকে ভ্রুক্ষেপই করছে না। মূসা (আ.) নিজে মযলূম। তিনি মযলূমের ব্যথা বুঝেন। তাই কিছুক্ষণ ইতঃস্তত করে মেয়ে দু'টির দিকে এগিয়ে গেলেন। তিনি তাদের সমস্যার কথা জিজ্ঞেস করলে তারা বলল, 'আমরা আমাদের পশুগুলিকে পানি পান করাতে পারি না, যতক্ষণ না রাখালরা তাদের পশুগুলিকে পানি পান করিয়ে চলে যায়। অথচ আমাদের পিতা খুবই বৃদ্ধ' (যিনি ঘরে বসে আমাদের অপেক্ষায় উদগ্রীব হয়ে আছেন)। অতঃপর তাদের পশুগুলি এনে মূসা পানি পান করালেন (তারপর মেয়ে দু'টি পশুগুলি নিয়ে বাড়ি চলে গেল)। মূসা (আ.) একটি গাছের ছায়ায় বসে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন,

رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ

'হে আমার পালনকর্তা! তুমি আমার উপর যে অনুগ্রহ নাযিল করবে, আমি তার মুখাপেক্ষী' (ক্বসস ২৮/২৪)। হঠাৎ দেখা গেল যে, বালিকাদ্বয়ের একজন সলজ্জ

পদক্ষেপে তাঁর দিকে আসছে। মেয়েটি এসে ধীর কণ্ঠে তাঁকে বলল, আমার পিতা আপনাকে ডেকেছেন, যাতে আপনি যে আমাদেরকে পানি পান করিয়েছেন, তার বিনিময় স্বরূপ আপনাকে পুরস্কার দিতে পারেন। (ক্বসস ২৮/২৩-২৫)

উল্লেখ্য যে, বালিকাদ্বয়ের পিতা ছিলেন মাদইয়ান বাসীদের নিকটে প্রেরিত বিখ্যাত নবী হযরত শু'আইব (আ.)। মুসা (আ.) ইতিপূর্বে তাঁকে চিনতেন না। তাঁর কাছে পৌঁছে মুসা (আ.) তাঁর বৃত্তান্ত সব বর্ণনা করলেন। শু'আইব (আ.) সবকিছু শুনে বললেন, لاَتَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الْظَالِمِيْنَ، 'ভয় করো না। তুমি যালেম সম্প্রদায়ের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছো'। এমন সময় বালিকাদ্বয়ের একজন বলল, পিতা! উনাকে বাড়িতে কর্মচারী হিসেবে রেখে দিন। কেননা إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِين আপনার কর্ম সহায়ক হিসেবে সেই-ই উত্তম হবে, যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত' (ক্বসস ২৮/২৬)। 'তখন তিনি মুসা (আ.)-কে লক্ষ্য করে বললেন, আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিবাহ দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার বাড়িতে কর্মচারী থাকবে। তবে যদি দশ বছর পূর্ণ করো, সেটা তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহ চাহেন তো তুমি আমাকে সদাচারী হিসাবে পাবে'। মুসা বলল, আমার ও আপনার মধ্যে এই চুক্তি স্থির হলো। দু'টি মেয়াদের মধ্য থেকে যেকোনো একটি পূর্ণ করলে আমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ থাকবে না। আমরা যা বলছি, আল্লাহ তার উপরে তত্ত্বাবধায়ক' (ক্বসস ২৮/২৫-২৮)।

মোহরানার চুক্তির মেয়াদ শেষ করে মুসা (আ.) আল্লাহর উপর ভরসা করে স্ত্রী-পরিবার নিয়ে বের হলেন পুনরায় মিসরের পথে। সফরের এক পর্যায়ে কনকনে শীতের রাতে মুসা (আ.) যখন তুর পাহাড়ে একখণ্ড আগুন দেখতে পেলেন, তখন তাঁর পরিবারকে বললেন, 'এখানেই অপেক্ষা করো। হয়তো আগুনের স্থান থেকে কোন দিকনির্দেশনা পাওয়া যাবে অথবা অন্তত গরম অনুভব করার জন্য সেখান থেকে মশাল ধরিয়ে আনা যাবে।'

মুসা (আ.) পাহাড়ে উঠে আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, সবুজ বৃক্ষের উপরে আগুন জ্বলছে। অথচ গাছের পাতা পুড়ছে না; বরং তার উজ্জ্বলতা আরও বেড়ে যাচ্ছে। বিস্ময়ে অভিভূত মূসা এক দৃষ্টে আগুনটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। হঠাৎ এক গুরুগম্ভীর এক আওয়াজ কানে এলো তাঁর চারপাশ থেকে-

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى- إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى

'অতঃপর যখন তিনি আগুনের কাছে পৌঁছলেন, তখন আওয়াজ এলো, হে মূসা!' 'আমিই তোমার পালনকর্তা। অতএব তুমি তোমার জুতা খুলে ফেলো। তুমি পবিত্র উপত্যকা তুওয়ায় রয়েছো' (ত্বহা ২০/১১-১২)। এর দ্বারা বিশেষ অবস্থায় পবিত্র স্থানে জুতা খোলার আদব প্রমাণিত হয়। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন,

وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى- إِنَّنِي أَنَا اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي- إِنَّ السَّاعَةَ ءاَتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى- فَلاَ يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لاَ يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى

'আর আমি তোমাকে মনোনীত করেছি। অতএব তোমাকে যা প্রত্যাদেশ করা হচ্ছে তা মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাক। নিশ্চয় আমিই আল্লাহ। আমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব আমার ইবাদত কর এবং আমার স্মরণে স্বলাত কায়েম কর। ক্বিয়ামত অবশ্যই আসবে, আমি তা গোপন রাখতে চাই; যাতে প্রত্যেকে তার কর্মানুযায়ী ফল লাভ করতে পারে। সুতরাং যে ব্যক্তি ক্বিয়ামতে বিশ্বাস রাখে না এবং নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, সে যেন তোমাকে নিবৃত্ত না করে। তাহলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।' (ত্বহা ২০/১৩-১৬)

এ পর্যন্ত আক্বীদা ও ইবাদতগত বিষয়ে নির্দেশ দানের পর এবার কর্মগত নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলছেন,

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى- قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى- قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى- فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى- قَالَ خُذْهَا وَلاَ تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى

'হে মুসা! তোমার ডান হাতে ওটা কি?' তিনি বললেন, এটা আমার লাঠি। এর উপরে আমি ভর দেই এবং এর দ্বারা আমার মেষপালের জন্য গাছের পাতা ঝেড়ে নামাই। তাছাড়া এর দ্বারা আমার অন্যান্য কাজও চলে। আল্লাহ বললেন, হে মুসা! তুমি ওটা ফেলে দাও। অতঃপর তিনি ওটা (মাটিতে) ফেলে দিতেই তা সাপ হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল। আল্লাহ বললেন, তুমি ওটাকে ধর, ভয় করো না, আমি এখুনি ওকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেব' (ত্বহা ২০/১৭-২১)।

এটি ছিল মুসা (আ.)-কে দেওয়া প্রথম মু'জিযা। কেননা মিসর ছিল ঐসময় জাদুবিদ্যায় শীর্ষস্থানে অবস্থানকারী দেশ। সেখানকার শ্রেষ্ঠ জাদুকরদের হারিয়ে দেওয়ার মাধ্যমেই

নবুয়াতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা আবশ্যক ছিল। সেজন্যই আল্লাহ তাঁকে সবদিক দিয়ে প্রস্তুত করে দিচ্ছিলেন। এর ফলে তিনি নিজের মধ্যে অনেকটা শক্তি ও স্বস্তি লাভ করলেন।

নবুয়াত লাভের পর হযরত মুসা (আ.) আল্লাহর পক্ষ থেকে দ্বীন প্রচারের জন্য আদিষ্ট হন। যেহেতু তাঁর মুখে জড়তা ছিল তাই তাঁর আবেদনের প্রেক্ষিতে আল্লাহ হযরত হারুন (আ'.)-কে নবুয়ত দান করেন এবং তাকে মুসা (আ.)-এর সহযোগী করে দেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন-

اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى- فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلٰٓى اَنْ تَزَكّٰى- وَ اَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى

“ফিরাউনের নিকট যাও নিশ্চয়ই সে সীমালঙ্ঘন করছে। অতঃপর বলো, তোমার পবিত্র হওয়ার আগ্রহ আছে কি? আর আমি কি তোমাকে তোমার প্রতিপালকের পথ দেখাব? যাতে তুমি তাকে ভয় করো।” (সূরা আন-নাযিয়াত, আয়াত ১৭-১৯)

আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তিনি তাঁর ভাই হারুন (আ.)-কে নিয়ে ফিরাউনের প্রাসাদে উপস্থিত হলেন। অন্যান্য নবীগণের মতো মুসা (আ.)-ও ফিরাউনকে তাওহীদের দাওয়াত দেয়ার পাশাপাশি তাঁকে ও তাঁর ভাই হারুন (আ.)-কে আল্লাহর রাসূল হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য আহবান করলেন। এরপর বনী ইসরাঈলকে তাদের সাথে পাঠানোর দাবি পেশ করলেন। ফিরাউন তাদের দাবি প্রত্যাখ্যান করল। সে বলল, "তুমি যেই রবের দাবি নিয়ে এসেছো সেই রব আবার কে এবং তুমি যে নবী হয়েছো তার প্রমাণ কী?" সাইয়্যিদিনা মুসা (আ.) প্রমাণ হিসেবে বিভিন্ন মু'জিযা দেখালেন। কিন্তু ফিরাউন সেগুলোকে জাদু আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করল। এরই জের ধরে, ফিরাউন শহরের বড় বড় সমস্ত জাদুকরদের মুসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে একত্রিত করল। ফিরাউন সেই জাদুকরদের প্রস্তাব দেয় যে, যদি তারা এই প্রতিযোগিতায় জিততে পারে তবে সে তাদের মোটা পারিশ্রমিক দিবে। সমস্ত জাদুকরেরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ালো। বিপক্ষে আছেন কেবলমাত্র মুসা ও হারুন (আ.)। মিশরের সমস্ত লোক এই দৃশ্যকে প্রত্যক্ষ করছে।

মুসা (আ.)-এর মোকাবিলায় জাদুকররা অসংখ্য সাপের জাদু প্রদর্শন করেছে। মহান আল্লাহ মুসা (আ.)-কে অভয় দেন এবং তাঁকে বিজয়ী করার ঘোষণা দেন। মহান আল্লাহ

মুসা (আ.)-কে তাঁর হাতের লাঠি নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেন। মুসা (আ.) তাঁর লাঠি নিক্ষেপ করতেই তা একটি বিরাট অজগর সাপ হয়ে যায়। এটা দেখে জাদুবিদ্যা বিশেষজ্ঞ জাদুকরদের বুঝতে বাকি রইল না যে এ কাজ জাদুর জোরে হতে পারে না; বরং নিঃসন্দেহে এটা মু'জিযা। তাই তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে আত্মসমর্পণ করল এবং সাথে সাথেই ঈমান আনার ঘোষণা দিল।

জাদুকরদের পরাজয় স্বীকারের পর ফিরাউন তার রাজনৈতিক কূটচালের মাধ্যমে জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। সে বলল, এই জাদুকররা সবাই মুসার শিষ্য। সে আরো বলল, হে জনগণ, এ লোকটি তোমাদের ধর্ম পরিবর্তন করে দেবে এবং দেশময় বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। (সূরা মু'মিন ৪০/২৬)। এভাবে ফিরাউন জাদুকরদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। এমনকি তাদের হত্যার হুমকিও দেয়। কিন্তু জাদুকররা তাদের ঈমানের ব্যাপারে অবিচল থাকে।

মুসা ও হারুন (আ'লাইহিমাস সালাম)-এর বিজয়ের সংবাদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং আল্লাহর ইচ্ছায় নিকৃষ্ট ফিরাউনের স্ত্রী আছিয়া (আ.) ঈমান আনয়ন করলেন। ফিরাউন এই দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে অত্যন্ত নির্মমভাবে তার স্ত্রী আছিয়াকে হত্যা করে। মৃত্যুর পূর্বে অন্যদের চেয়ে কঠিন শাস্তি দেয়া হয় তাঁকে। দেহ রক্তাক্ত হয়, ক্ষতবিক্ষত হয় শরীর। তবে তিনি ধৈর্যহারা হননি, ঈমান ছাড়েননি। জীবনের বিনিময়ে ঈমানকে রক্ষা করেন। দুনিয়ার রাজপ্রাসাদের বিনিময়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন জান্নাতে আল্লাহর পাশে একটি ঘর। আল্লাহর প্রতিবেশী হওয়ার আকুলতা ব্যক্ত করে বলেন,

رَبِّ ابْنِ لِىْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَ نَجِّنِىْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَ عَمَلِهٖ وَ نَجِّنِىْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ

'হে আমার প্রতিপালক! আমার জন্য আপনার কাছে জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করুন। আমাকে ফেরাউন ও তার দুষ্কর্ম থেকে উদ্ধার করুন। আমাকে মুক্তি দিন অত্যাচারী সম্প্রদায় থেকে।' (৬৬:১১)

মুসা (আ.)-এর দাওয়াতকে যখন ফিরাউন প্রত্যাখ্যান করল তখন আল্লাহ তাআ'লা ফিরাউন ও তার গোষ্ঠীর মধ্যে নানা ধরনের শাস্তি চাপিয়ে দিলেন। আল্লাহ তাআ'লা কখনো দুর্ভিক্ষ দিয়ে, কখনো তাদের ফসল নষ্ট করে, কখনো তুফান পাঠিয়ে, কখনো পঙ্গপাল, কখনো উকুন, কখনো ব্যাঙ এবং কখনো রক্ত পাঠিয়ে তাদেরকে শায়েস্তা

করেছেন। প্রত্যেকতা শাস্তি যখন মারাত্মক আকার ধারণ করত ফিরাউনের লোকজন মুসা (আ.)-কে দু'আ করতে বলত এবং অঙ্গীকার করত যে, শাস্তি চলে গেলে তারা ঈমান আনবে অথবা বনী ইসরাঈলকে তাদের সাথে চলে যেতে দিবে। মুসা (আ.) প্রত্যেকবার দু'আ করতেন এবং তাঁর দু'আর বরকতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা শাস্তি উঠিয়ে নিতেন। কিন্তু পরক্ষণেই ফিরাউন অঙ্গীকার ভঙ্গ করত।

এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা মুসা (আ.)-কে নির্দেশ দিলেন বনী ইসরাঈলকে নিয়ে মিশর ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। তাদের চলে যাওয়ার খবর জানতে পেরে কুটিল হামানসহ আরও উজিররা ফিরাউনকে কুপরামর্শ দিতে লাগলো। তাদের কুপরামর্শে ফিরাউন সৈন্যসামন্ত নিয়ে তাদের পিছনে ধাওয়া করল। মুসা (আ.) ও তাঁর অনুসারীরা ততক্ষণে লোহিত সাগরের তীরে এসে পৌঁছে গেছেন। এমন সময় তারা পিছনে তাকিয়ে দেখতে পেলেন, ফিরাউনের অগণিত সৈন্য তাদের ধরার জন্য এগিয়ে আসছে। তাদের পিছনে এই বিপদ, সামনে প্রকাণ্ড লোহিত সাগর। বনী ইসরাঈলের লোকেরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে মুসা (আ.)-কে দোষারোপ করতে শুরু করল। এমন সময় মহান আল্লাহ তাআ'লা মুসা (আ.)-কে আদেশ করলেন, 'মুসা, তোমার লাঠি দিয়ে সমুদ্রের উপর আঘাত করো'। আল্লাহর নির্দেশমতো তিনি তাই করলেন। বিশাল সাগর দুই ভাগে ভাগ হয়ে দেয়ালের মতো দুইপাশে দাঁড়িয়ে রইলো। সেই পথ দিয়ে মুসা(আ.) ও তাঁর অনুসারীরা নিরাপদে ওপারে চলে গেলেন। তখনও সাগরের সেই রাস্তা সেভাবেই রয়ে গেল। ফিরাউন তার লোকজন এবং সৈন্যসামন্তসহ ওপারে এসে দেখলো, সাগরের মাঝে একটি আশ্চর্য রাস্তা তৈরি হয়েছে এবং সেখান থেকে মুসা (আ.) ও তাঁর লোকজন নিরাপদে পার হয়ে গেছেন। সে মুসা (আ.) ও তাঁর অনুসারীদের আক্রমণ করতে তার বাহিনী নিয়ে লোহিত সাগরের সেই রাস্তায় নেমে পড়ল। যখন ফিরাউনের বাহিনী সাগরের ঠিক মাঝামাঝি এসে পৌঁছালো তখন আল্লাহ মুসা (আ.)-কে পুনরায় লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত করতে বললেন। লাঠি দ্বারা সাগরে আঘাত করার সাথে সাথে দুই দিক থেকে পানির খাড়া উঁচু স্রোত ফিরাউন ও তার সৈন্যদের উপর পড়লো। ধ্বংস হয়ে গেল ফিরাউন ও তার বাহিনী।

আল্লামা তাবারী বলেন, ফিরাউন সাগরে ডোবার সময় বিশ্বাস করেছিল যে, মুসা (আ.) ও বনী ইসরাঈল সত্যের উপর আছে। কিন্তু এই শেষ সময়ের ঈমান তার কোনো উপকার করতে পারেনি।
ফিরাউনের সাগরডুবি ও মুসার (আ.)-এর মুক্তি লাভের এ অলৌকিক ঘটনাটি ঘটেছিল ১০ই মুহাররম আশুরার দিন। এ দিনের স্মরণে আল্লাহর শুকরিয়াস্বরূপ মুসা (আ.) ও বনু ইসরাঈলগণ প্রতি বছর এ দিন একটি নফল সিয়াম পালন করতেন। এই সিয়াম যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। জাহেলী আরবেও তা চালু ছিল। নবুয়াত-পূর্ব কালে ও পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ আশুরার সিয়াম রাখতেন। ২রা হিজরীতে রমযানের সিয়াম ফরয হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আশুরার সিয়াম মুসলমানদের জন্য 'ফরয' ছিল। এরপরে এটি নফলে পরিণত হয়।

সাগরডুবি থেকে নাজাত পেয়ে মুসা (আ.) ও বনু ইসরাঈল বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে রওনা হন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তাদেরকে বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়ের লক্ষ্যে জিহাদের নির্দেশ দেন। সেখানে তখন আমালেক্কাদের রাজত্ব ছিল। যারা ছিল বিগত আদ বংশের লোক এবং বিশালদেহী ও দুর্ধর্ষ প্রকৃতির। নবী মুসা (আ.)-এর মাধ্যমে আল্লাহ তাদের আগাম বিজয়ের সুসংবাদ দেন। তথাপি তারা ভীত হয় এবং জিহাদে যেতে অস্বীকার করে। শক্তিশালী ফিরাউন ও তার বিশাল বাহিনীর চাক্ষুস ধ্বংস দেখেও তারা আল্লাহর রহমতের উপর ভরসা করতে পারেনি। ফলে আল্লাহর অবাধ্যতার শাস্তিস্বরূপ মিসর ও শামের মধ্যবর্তী তীহ্ প্রান্তরের উন্মুক্ত জায়গায় তারা ৪০ বছর অবরুদ্ধ জীবন অতিবাহিত করতে বাধ্য হয়।

ফিরআউন ও তার দলবলকে ধ্বংস করার পর প্রয়োজন দেখা দিল যে, বনী ইসরাঈলদের হিদায়াত ও পথ নির্দেশনার জন্য কোনো ধর্মগ্রন্থ তাদেরকে দেওয়া হোক। সেজন্য মহান আল্লাহ মুসা (আ.)-কে ত্রিশ রাত্রির জন্য তুর পাহাড়ে আহবান করলেন, পরে আরো দশ রাত্রি যোগ করে পুরো চল্লিশ রাত্রি করা হলো। এসময় মুসা (আ.)-এর উপর তাওরাত নাযিল হয়। মুসা (আ.) আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদা অনুসারে তুর পর্বতে গিয়ে যখন এতেকাফ করার ইচ্ছা করেন, তখন যাওয়ার সময় তাঁর ভাই নবী হারুন (আ.)-কে নিজের স্থলাভিষিক্ত করলেন; যাতে তিনি বনী ইসরাঈলদের মধ্যে হিদায়াত ও সংশোধনের কাজ চালিয়ে যান।

মুসা (আ.) ত্বুর পর্বতে গেলে সামেরী নামক এক ব্যক্তি সম্পূর্ণ বনী ইসরাঈলকে পথভ্রষ্ট করে ফেলে। অর্থাৎ তারা গো-বৎসের পূজায় লিপ্ত হয়ে যায়। হারুন (আ.) তাদেরকে সতর্ক করে বললেন,

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي- قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى

'কওম! তোমরা এই গো-বৎস দ্বারা পরীক্ষায় পতিত হয়েছো। তোমাদের পালনকর্তা অতীব দয়ালু। অতএব তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ মেনে চলো। কিন্তু সম্প্রদায়ের লোকেরা বলল, 'মুসা আমাদের কাছে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা এর পূজায় রত থাকব। (ত্বহা ২০/৯০-৯১)

অতঃপর মুসা (আ.) এলেন এবং সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে সব কথা শুনলেন। হারুন (আ.)ও তাঁর বক্তব্য পেশ করলেন। সামেরীও তার কপটতার কথা অকপটে স্বীকার করল। অতঃপর মূসা (আ.) আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী শাস্তি ঘোষণা করলেন। শাস্তিস্বরূপ আল্লাহ তাদেরকে তাওবা করার পর একে অপরকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। এভাবে তাদের অনেক লোককে হত্যা করা হলো আর কিছু সংখ্যক ক্ষমাপ্রাপ্ত হলো।

একদিন ইসরাঈল-বংশধরদের মধ্যে একটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। হত্যাকারী কে তা জানা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তখন, আল্লাহ তাদেরকে একটি গরু জবাই করতে নির্দেশ দেন। ইসরাঈল-বংশধররা কোন বাদানুবাদে প্রবৃত্ত না হলে এতসব শর্তও আরোপিত হতো না, বরং যেকোন গরু জবাই করলেই তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারতো। কিন্তু তারা একের পর এক প্রশ্ন করে বিভিন্ন শর্ত আরোপ করে নেয়, নিজেদের উপর কষ্টকে চাপিয়ে নেয়। শেষ পর্যন্ত তারা সেটা করতে সমর্থ হয়। তারপর গরু জবাই করার পর মৃতদেহে সে গরুর গোশতের টুকরো স্পর্শ করাতেই সে জীবিত হয়ে যায় এবং হত্যাকারীর নাম বলে তৎক্ষণাৎ আবার মারা যায়। [ইবনে কাসীর থেকে সংক্ষেপিত]

সাগরডুবি থেকে মুক্তি পাবার পর হতে বনী ইসরাঈল মূর্তিপূজার আবদার, গো-বৎস পূজা, তাওরাত মানতে অস্বীকার এবং আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখার যিদ প্রভৃতি অবাধ্যতায় একের পর এক নিয়োজিত ছিল। এতকিছুর পরেও মুসা (আ.)-এর দু'আর বরকতে

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তাদের অসংখ্য নিয়ামত দিয়েছিলেন। ফিরাউনের কবল থেকে মুক্তি, সমুদ্রে রাস্তার ব্যবস্থা করে তাদের বের করে আনা, যখন তারা আমালেকা সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে অস্বীকৃতি জানালো এবং আল্লাহ তায়ালা তাদের তীহ ময়দানে বিভ্রান্তের মতো করে ঘুরাচ্ছিলন, সে সময় তাদের মেঘ দিয়ে ছায়া প্রদান, মান্না ও সালওয়া (আকাশ থেকে নাজিল করা বিশেষ খাবার) নাজিলকরণ, সুমিষ্ট পানির ব্যবস্থা করণ ইত্যাদি। তাছাড়া তাদের হিদায়াতের জন্য অগণিত অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ ও তৎকালীন বিশ্বের সবার উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানও উল্লেখযোগ্য।

নবী মুসা (আ.)-এর সঙ্গে বারবার বেআদবী ও অবাধ্যতার পরিণামে এবং আল্লাহর আয়াত সমূহকে অস্বীকার ও পরবর্তীতে নবীগণকে অন্যায় ভাবে হত্যার কারণে আল্লাহ তাদের উপরে চিরস্থায়ী গযব ও অভিসম্পাৎ নাযিল করলেন। আল্লাহ বলেন, وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآؤُوْا بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ 'আর তাদের উপরে লাঞ্ছনা ও পরমুখাপেক্ষিতা আরোপিত হলো এবং তারা আল্লাহর রোষানলে পতিত হলো।' (বাক্বারাহ ২/৬১)

ইউনুস (আ'লাইহিস সালাম)

ইউনুস (আ.) বর্তমান ইরাকের মূছেল নগরীর নিকটবর্তী 'নীনাওয়া' (نينوى) জনপদের অধিবাসীদের প্রতি প্রেরিত হন। তিনি তাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দেন এবং ঈমান ও সৎকর্মের প্রতি আহবান জানান। কিন্তু তারা তাঁর প্রতি অবাধ্যতা প্রদর্শন করে। বারবার দাওয়াত দিয়ে প্রত্যাখ্যাত হলে আল্লাহর হুকুমে তিনি এলাকা ত্যাগ করে চলে যান। ইতিমধ্যে তার কওমের উপরে আযাব নাযিল হওয়ার পূর্বাভাস দেখা দিল। জনপদ ত্যাগ করার সময় তিনি বলে গিয়েছিলেন যে, তিনদিন পর সেখানে গযব নাযিল হতে পারে। তারা ভাবল, নবী কখনো মিথ্যা বলেন না। ফলে ইউনুস (আ.)-এর কওম ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে দ্রুত কুফর ও শিরক হতে তওবা করে এবং জনপদের সকল আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা এবং গবাদিপশু সব নিয়ে জঙ্গলে পালিয়ে যায়। সেখানে গিয়ে তারা বাচ্চাদের ও গবাদিপশু গুলিকে পৃথক করে দেয় এবং নিজেরা আল্লাহর দরবারে কায়মনোচিত্তে কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। তারা সর্বান্ত:করণে তওবা করে এবং আসন্ন গযব হতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করে। ফলে আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করেন এবং তাদের উপর থেকে আযাব উঠিয়ে নেন।

ওদিকে ইউনুস (আ.) ভেবেছিলেন যে, তাঁর কওম আল্লাহর গযবে ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু পরে যখন তিনি জানতে পারলেন যে, আদৌ গযব নাযিল হয়নি, তখন তিনি চিন্তায় পড়লেন যে, এখন তার কওম তাকে মিথ্যাবাদী ভাববে এবং মিথ্যাবাদীর শাস্তি হিসেবে প্রথা অনুযায়ী তাকে হত্যা করবে। তখন তিনি জনপদে ফিরে না গিয়ে অন্যত্র হিজরতের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। এ সময় আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষা করাটাই যুক্তিযুক্ত ছিল। কিন্তু তিনি তা করেননি। যদিও বাহ্যত এটা কোন অপরাধ ছিল না। কিন্তু পয়গম্বর ও নৈকট্যশীলগণের মর্তবা অনেক উর্ধ্বে। তাই আল্লাহ তাদের ছোট-খাট ত্রুটির জন্যও পাকড়াও করেন। ফলে তিনি আল্লাহর পরীক্ষায় পতিত হন।

হিজরতকালে নদী পার হওয়ার সময় মাঝ নদীতে হঠাৎ নৌকা ডুবে যাবার উপক্রম হলে মাঝি বলল, একজনকে নদীতে ফেলে দিতে হবে। নইলে সবাইকে ডুবে মরতে হবে। এজন্য লটারী হলে পরপর তিনবার তাঁর নাম আসে। ফলে তিনি নদীতে নিক্ষিপ্ত হন। সাথে সাথে আল্লাহর হুকুমে বিরাটকায় এক মাছ এসে তাঁকে গিলে ফেলে। কিন্তু মাছের পেটে তিনি হযম হয়ে যাননি। বরং এটা ছিল তাঁর জন্য নিরাপদ কয়েদখানা (ইবনে কাছীর, আম্বিয়া ৮৭-৮৮)। মাওয়ার্দী বলেন, মাছের পেটে অবস্থান করাটা তাঁকে শাস্তি দানের উদ্দেশ্যে ছিল না। বরং আদব শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ছিল। যেমন পিতা তার শিশু সন্তানকে শাসন করে শিক্ষা দিয়ে থাকেন।' (কুরতুবী, আম্বিয়া ৮৭)

ইউনুস (আ.) মাছের পেটে কত সময় বা কতদিন ছিলেন, সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। আসলে এইসব মতভেদের কোন গুরুত্ব নেই। কেননা এসবের রচয়িতা হলো ইহুদী গল্পকারগণ। প্রকৃত ঘটনা আল্লাহ ভালো জানেন।

ইউনুস (আ.)-এর মাছের পেট থেকে মুক্তি পাওয়া সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেছেন,

فَلَوْلاَ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ- لَلَبِثَ فِيْ بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ- فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيْمٌ- وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَّقْطِيْنٍ- وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيْدُوْنَ- فَآمَنُوْا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِيْنٍ

'অতঃপর যদি সে আল্লাহর গুণগানকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হত। তাহলে সে ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত মাছের পেটেই থাকত। অতঃপর আমরা তাকে একটি বিজন প্রান্তরে নিক্ষেপ করলাম, তখন সে রুগ্ন ছিল। আমরা তার উপরে একটি লতা বিশিষ্ট বৃক্ষ উদ্গত করলাম এবং তাকে লক্ষ বা তদোধিক লোকের দিকে প্রেরণ করলাম। তারা

ঈমান আনল। ফলে আমরা তাদেরকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত জীবন উপভোগ করার সুযোগ দিলাম। (ছ্বফফাত ৩৭/১৪৩-১৪৮)।

'ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত সে মাছের পেটেই থাকত'-এর অর্থ সে আর জীবিত বেরিয়ে আসতে পারতো না। বরং মাছের পেটেই তার কবর হত এবং সেখান থেকেই ক্বিয়ামতের দিন তার পুনরুত্থান হত। অন্যত্র ইউনুসের ক্রুদ্ধ হয়ে নিজ জনপদ ছেড়ে চলে আসা, মাছের পেটে বন্দী হওয়া এবং ঐ অবস্থায় আল্লাহর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَذَا النُّوْنِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَن لَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ- فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِيْنَ

‘এবং মাছওয়ালা (ইউনুস)-এর কথা স্মরণ কর, যখন সে (আল্লাহর অবাধ্যতার কারণে লোকদের উপর) ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গিয়েছিল এবং বিশ্বাসী ছিল যে, আমরা তার উপরে কোনরূপ কষ্ট দানের সিদ্ধান্ত নেব না। অতঃপর সে (মাছের পেটে) ঘন অন্ধকারের মধ্যে আহবান করল (হে আল্লাহ!) তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমি পবিত্র। আমি সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর আমরা তার আহবানে সাড়া দিলাম এবং তাকে দুশ্চিন্তা হতে মুক্ত করলাম। আর এভাবেই আমরা বিশ্বাসীদের মুক্তি দিয়ে থাকি।’ (আম্বিয়া ২১/৮৭-৮৮)

উপরোক্ত আয়াত সমূহে প্রতীয়মান হয় যে, ইউনুস (আ.) মাছের পেটে থাকার পরে আল্লাহর হুকুমে নদীতীরে নিক্ষিপ্ত হন। মাছের পেটে থাকার ফলে স্বাভাবিকভাবেই তিনি রুগ্ন ছিলেন। ঐ অবস্থায় সেখানে উদ্গত লাউ জাতীয় গাছের পাতা তিনি খেয়েছিলেন, যা পুষ্টিসমৃদ্ধ ছিল। অতঃপর সুস্থ হয়ে তিনি আল্লাহর হুকুমে নিজ কওমের নিকটে চলে যান। যাদের সংখ্যা এক লক্ষ বা তার বেশী ছিল। তারা তাঁর উপরে ঈমান আনলো। ফলে পুনরায় শিরকী কর্মকান্ডে লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তাদেরকে অনুগ্রহ করেন এবং দুনিয়া ভোগ করার সুযোগ দেন।

দাউদ (আ'লাইহিস সালাম)

সাইয়্যিদিনা দাউদ (আ.) ছিলেন ইয়াকুব (আ.)-এর পুত্র ইয়াহুদা এর বংশধর। আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর পূর্বে যে ২ জন নবী রাষ্ট্র ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে দাউদ (আ.) অন্যতম। অর্থ্যাৎ আল্লাহর রাসূল ﷺ, দাউদ (আ.) এবং উনার সন্তান সুলাইয়মান (আ.) একাধারে নবী এবং রাষ্ট্র ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। বর্তমান ফিলিস্তিন সহ ইরাক, শাম, সিরিয়ার এই যে বিস্তীর্ণ এলাকা; এই পুরো এলাকা নিয়ে তাঁদের রাজত্ব ছিল। দাউদ (আ.)-এর নেতৃত্বে এই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম আল্লাহ তায়ালার একটি অনুগত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় যেটার সীমানা ছিলো আকাবাহ উপসাগর থেকে শুরু করে ফুরাত নদীর পশ্চিম তীর পর্যন্ত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা সায়্যিদিনা দাউদ (আ.)-কে জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তা,আল্লাহভীতি দিয়ে ধন্য করেছিলেন। দাউদ (আ.)-কে বনী ইসরাঈলের লোকেরা তাদের রাজা বানিয়েছিলো। তালুত বাদশার নেতৃত্বে দাউদ (আ.) যখন জালুতকে হত্যা করলো তখন তালুত বাদশাহর পরবর্তীতে দাউদ (আ.) বনী ইসরাঈলের রাজা হয়ে গেলেন। সায়্যিদিনা মুসা (আ.) যখন বনী ইসরাঈলকে নিয়ে লোহিত সাগর পার হয়ে তীহ্ প্রান্তরে চল্লিশ বছর অবস্থান করলেন। মুসা (আ.)-এর ইন্তিকালের পর মুসা (আ.)-এর ভাগিনা ইউসা ইবনে নূন (আ.) বনী ইসরাঈলের সবাইকে নিয়ে ফিলিস্তিনে আমালেকাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করলেন এবং তাদেরকে হটিয়ে তারা ফিলিস্তিন দখল করলেন। এরপর সেখানেই তারা থাকতে লাগলেন। এভাবে সেখানে দীর্ঘদিন থাকার পরে পুনরায় যখন তারা বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দিলো, আল্লাহর পাঠানো বিধানকে তারা অমান্য করতে শুরু করলো, নাফরমানি শুরু করে দিলো আল্লাহ তায়ালা তাদের উপর আমালেকাদেরকে চাপিয়ে দিলেন। অর্থাৎ আমালেকারা বনী ইসরাঈলদের উপর বিজয় লাভ করল। এরপর বনী ইসরাঈলের লোকেরা বিচ্ছিন হয়ে বিভিন্ন দিকে চলে গেল। এভাবে বনি ইসরাঈলের লোকেরা পুরো পৃথিবীতে নিগৃত হয়ে বসবাস শুরু করল। এরপর স্যামুয়েল (আ.) নামের একজন নবীকে আল্লাহ তায়ালা বনী ইসরাঈলদের কাছে পাঠালেন। লোকেরা তাঁকে বলে আপনি আমাদের জন্য একজন সেনাপতি দানের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করুন, যাতে আমরা আমাদের পূর্বের ঐতিহ্য ফিরে পাই এবং বর্তমান দুর্দশা থেকে মুক্তি পাই। এই ঘটনা আল্লাহ তার শেষনবীকে শুনিয়েছেন নিম্নোক্ত ভাষায়-

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوْا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكاً نُّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلاَّ تُقَاتِلُوْا قَالُوْا وَمَا لَنَا أَلاَّ نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ

وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَآئِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِيْنَ

‘তুমি কি মূসার পরে বনু ইস্রাঈলদের একদল নেতাকে দেখনি, যখন তারা তাদের নবীকে বলেছিল, আমাদের জন্য একজন শাসক প্রেরণ করুন, যাতে আমরা (তার নেতৃত্বে) আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে পারি। নবী বললেন, তোমাদের প্রতি কি এমন ধারণা করা যায় যে, লড়াইয়ের নির্দেশ দিলে তোমরা লড়াই করবে? তারা বলল, আমাদের কি হয়েছে যে, আমরা আল্লাহর পথে লড়াই করব না? অথচ আমরা বিতাড়িত হয়েছি নিজেদের ঘর-বাড়ি ও সন্তান-সন্ততি হতে! অতঃপর যখন লড়াইয়ের নির্দেশ হলো তখন সামান্য কয়েকজন ছাড়া বাকিরা সবাই ফিরে গেল। বস্তুত আল্লাহ যালেমদের ভালো করেই জানেন।’ (২/২৪৬)

বনু ইসরাঈলগণের নিকটে একটা সিন্দুক ছিল। যার মধ্যে তাদের নবী মুসা, হারুন ও তাঁদের পরিবারের ব্যবহৃত কিছু পরিত্যক্ত সামগ্রী ছিল। তারা এটাকে খুবই বরকতময় মনে করত এবং যুদ্ধকালে একে সম্মুখে রাখত। একবার আমালেকাদের সাথে যুদ্ধের সময় বনু ইসরাঈলগণ পরাজিত হলে আমালেকাদের বাদশাহ জালুত উক্ত সিন্দুকটি নিয়ে যায়। তবে জালুতের নির্দেশে কাফিররা যেখানেই সিন্দুকটি রাখে, সেখানেই দেখা দেয় মহামারী ও অন্যান্য বিপদাপদ। অবশেষে অতিষ্ট হয়ে তারা একে তার প্রকৃত মালিকদের কাছে পাঠিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিল এবং গরুর গাড়িতে উঠিয়ে হাঁকিয়ে দিল। তখন ফেরেশতাগণ আল্লাহর নির্দেশমতে গরুর গাড়িটিকে তাড়িয়ে এনে তালুতের ঘরের সম্মুখে রেখে দিল। বনু ইসরাঈলগণ এই দৃশ্য দেখে সবাই একবাক্যে তালুতের নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করল। অতঃপর তালুত আমালেকাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার প্রস্তুতি শুরু করলেন।

অতঃপর তালুত যখন সৈন্যদল নিয়ে বের হলো, তখন সে বলল, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন একটি নদীর মাধ্যমে। যে ব্যক্তি সেই নদী হতে পান করবে, সে ব্যক্তি আমার দলভুক্ত নয়। আর যে ব্যক্তি স্বাদ গ্রহণ করবে না, সেই-ই আমার দলভুক্ত হবে। অতঃপর সামান্য কয়েকজন ব্যতীত সবাই সে পানি থেকে পান করল এবং পানি পানকারী হাজারো সৈনিক নদী পারে আলস্যে ঘুমিয়ে পড়ল। স্বল্প সংখ্যক ঈমানদার সাথী নিয়েই তালুত চললেন সেকালের সেরা সেনাপতি ও শৌর্য-বীর্যের প্রতীক আমালেকাদের বাদশাহ জালুতের বিরুদ্ধে। অল্প সংখ্যক লোক বলতে

লাগলো, আমরা জালুতের সাথে কিছুতেই পেরে উঠবো না। তবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা পূর্ব থেকেই তাদের বিজয় লিখে রেখেছিলেন।

জালুত বিরাট সাজ-সজ্জা করে হাতিতে সওয়ার হয়ে সামনে এসে আস্ফালন করতে লাগল এবং সে যুগের যুদ্ধরীতি অনুযায়ী প্রতিপক্ষের সেরা যোদ্ধাকে আহবান করতে থাকল। অল্পবয়স্ক বালক দাউদ নিজেকে সেনাপতি তালুতের সামনে পেশ করলেন। তালুত তাকে পাঠাতে রাজি হলেন না। কিন্তু দাউদ নাছোড় বান্দা। অবশেষে তালুত তাকে নিজের তরবারি দিয়ে উৎসাহিত করলেন এবং আল্লাহর নামে জালুতের মোকাবিলায় প্রেরণ করলেন।

অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত জালুতকে মারা খুবই কঠিন ছিল। কেননা তার সারা দেহ ছিল লৌহ বর্মে আচ্ছাদিত। তাই তরবারি বা বল্লম দিয়ে তাকে মারা অসম্ভব ছিল। আল্লাহর ইচ্ছায় হযরত দাউদ (আ.) পাথর নিক্ষেপে ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। দাউদ (আ.) পকেট থেকে পাথর খন্ড বের করে হাতির পিঠে বসে থাকা জালুতের চক্ষু বরাবর নিশানা করে এমন জোরে মারলেন যে, তাতেই জালুতের চোখ এবং মাথা ফেটে মগয বের হয়ে গেল। এভাবে জালুত মাটিতে লুটিয়ে পড়লে তার সৈন্যরা পালিয়ে গেল। যুদ্ধে তালুত বিজয় লাভ করলেন। যেমন আল্লাহ বলেন,

فَهَزَمُوْهُمْ بِإِذْنِ اللهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوْتَ وَآتَاهُ اللهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَآءُ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَـكِنَّ اللهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِيْنَ

'অতঃপর তারা আল্লাহর হুকুমে তাদেরকে পরাজিত করল এবং দাউদ জালুতকে হত্যা করল। আর আল্লাহ দাউদকে দান করলেন রাজ্য ও দূরদর্শিতা এবং তাকে শিক্ষা দান করলেন, যা তিনি চাইলেন। বস্তুত আল্লাহ যদি এভাবে একজনকে অপরজনের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ বিশ্ববাসীর প্রতি একান্তই দয়াশীল।' (বাক্বারাহ ২/২৫১)

এই ঘটনার পর বনী ইসরাঈলের কাছে দাউদ (আ.) অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন এবং তালুত নিজের কন্যার সাথে দাউদ (আ.)-এর বিয়ে দিলেন। পরবর্তীতে তালুতের শাসনের অবসান হলে দাউদ (আ.) বনী ইসরাঈলদের শাসক নির্বাচিত হন। তিনি ঠিক কোন সময়ে নবী হয়েছে তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে অনেকে মনে করেন, অন্যান্য নবীদের ন্যায় তিনিও চল্লিশ বছর বয়সে নবুয়তপ্রাপ্ত হন।

আল্লাহ প্রত্যেক নবীকে স্বতন্ত্র কিছু বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। সে মতে, দাউদ (আ.)-এরও কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল। মৌলিক মর্যাদায় সব নবী-রাসুল সমান হলেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কোনো কোনো নবীকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। দাউদ (আ.) ছিলেন তাঁদেরই একজন। কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলছেন, 'আমি দাউদকে আমার পক্ষ থেকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।' (৩৪/১০)

দাউদ (আ.)-এর আগে সাধারণত বনী ইসরাঈলের এক গোত্র থেকে নবী এবং অন্য গোত্র থেকে শাসক নির্বাচন করা হতো। বলা হয়, ইয়াহুদার বংশ থেকে নবী এবং ইউসুফ (আ.)-এর বংশ থেকে শাসক নির্বাচন করা হতো। কিন্তু দাউদ (আ.) প্রথম ব্যক্তি, যিনি একই সঙ্গে নবুয়ত ও রাজত্ব লাভ করেছিলেন। যেমন আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ তাঁকে রাজত্ব ও প্রজ্ঞা দান করেছিলেন।' (২/২৫১)

চমৎকার সুরেলা গলা, সুন্দর কণ্ঠ আল্লাহ তায়া'লা সবাইকে দেন না। এই ব্যাপারে সায়্যিদিনা দাউদ (আ.) ছিলেন নবীদের মধ্যে অনন্য। তিনি অত্যন্ত মধুর কণ্ঠে যাবুর পাঠ করতেন। যাতে পশু, পাখি, এমনকি মাছ পর্যন্ত বিমোহিত হতো, পাহাড় তাসবীহ শুরু করত। পর্বত ও পশুপাখি তাঁর আনুগত্য করত। দাউদ (আ.) বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু তিনি রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে কোনো ভাতা গ্রহণ করতেন না। নিজ হাতে জীবিকা উপার্জন করতেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'ব্যক্তির জন্য সর্বোত্তম জীবিকা হলো, যা সে নিজ হাতে উপার্জন করে। আল্লাহর নবী দাউদ (আ.) নিজ হাতে উপার্জন করতেন' (সুনানে তিরমিজি)। নিজ হাতে উপার্জিত অর্থের চেয়ে শ্রেষ্ঠ অর্থ আর হয় না। এত বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতাপশালী একজন অধিপতি হয়েও তিনি নিজ হাতে উপার্জিত অর্থ থেকে জীবনধারণ করতেন। পৃথিবীতে আল্লাহ এমন কোনো নবী পাঠাননি, যারা মেষ চড়াননি। সুতরাং সব নবীরা অনেক পরিশ্রমী ছিলেন। পরিশ্রম করলে লোনা পানিও দেহ থেকে বের হয়ে যায় এবং সেই লোনা পানিতে জন্ম নেয় সফলতার বীজ। এটাই হচ্ছে নবীদের পয়গাম; এটাই হচ্ছে নবীদের স্লোগান। তাই পরিশ্রমে লজ্জা নাই, কাজে লজ্জা নাই। লজ্জা হচ্ছে অলসতায়। সাইয়্যিদিনা দাউদ (আ.) রাজপ্রাসাদে থাকতেন, কিন্তু রাতের বেলা তাহাজ্জুদ পড়তে ভুলে যেতেন না। তিনি রাজত্ব পরিচালনা করতেন, তবে একদিন অন্তর অন্তর রোযা রাখতে ভুলে যেতেন না। দাউদ (আ.) এর বৈশিষ্ট্য থেকে আমাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। আমরা যত ধনীই হই না কেন, আমাদের আত্মার খোরাকের জন্য কিন্তু অবশ্যই আধাত্মিকতার দরকার

আছে। এই আধাত্মিক উন্নয়ন আমাদেরকে প্রশান্তির সন্ধান দিবে। আল্লাহ তায়া’লা আমাদের সবাইকে কথাগুলো বুঝার ও সে অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করুক।

সুলায়মান (আ'লাইহিস সালাম)

সাইয়্যিদিনা সুলায়মান (আ.) ছিলেন দাউদ (আ.)-এর সন্তান। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলছেন,

و وهبنا لداوٗد سليمن نعم العبد انهٗ اواب

“আর আমি দাউদকে (সন্তান হিসেবে) দান করলাম সুলায়মান। সে কতই না উত্তম বান্দা! নিঃসন্দেহে সে ছিল অতিশয় আল্লাহ অভিমুখী।” (৩৮/৩০)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আরও বলেন,

وَ كُلًّا اٰتَيۡنَا حُكۡمًا وَّ عِلۡمًا

“আর আমি তাদের উভয়কেই (দাউদ ও সুলায়মান আ.) দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান।” (২১/৭৯

দাউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র সুলাইমান (আ.) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। শেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর আবির্ভাবের ন্যূনতম ১৫০০ বছর পূর্বে তিনি নবী হন। সুলায়মান (আ.) ছিলেন পিতার ১৯ জন পুত্রের অন্যতম। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তাঁকে জ্ঞানে, প্রজ্ঞায় এবং নবুওয়াতের সম্পদে সমৃদ্ধ করেন। এছাড়াও তাঁকে এমন কিছু নেয়ামত দান করেন যা ইতিপূর্বে কোনো নবীকে দান করা হয়নি। ইমাম বাগাভী (রহ.) ইতিহাসবিদগণের বরাতে বলেন, সুলায়মান (আ.)-এর মোট বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর। ১৩ বছর বয়সে তিনি রাজকার্য হাতে নেন এবং শাসনের চতুর্থ বছরে বায়তুল মুকাদ্দাস এর নির্মাণ কাজ শুরু করেন। তিনি ৪০ বছরকাল রাজত্ব করেন। কিন্তু তিনি ঠিক কত বছর বয়সে নবী হয়েছিলেন তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তিনি ছিলেন শাম এবং ইরাক অঞ্চলে পিতার রেখে যাওয়া রাজ্যের বাদশাহ। তাঁর রাজ্য তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে সুখী এবং শক্তিশালী রাজ্য ছিল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা নবী সুলায়মান (আ.)-কে তাঁর বাল্যকালেই গভীর প্রজ্ঞা এবং দূরদর্শিতা দান করেছিলেন। ছাগলপালের মালিক এবং শস্যক্ষেতের মালিকের মধ্যে পিতা দাউদ (আ.) যেভাবে বিরোধ মীমাংসা করেছিলেন, বালক সুলায়মান (আ.) তার চেয়ে উত্তম ফায়সালা পেশ করেছিলেন। ফলে

হযরত দাউদ (আ.) নিজের পূর্বের রায় বাতিল করে পুত্রের দেয়া প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং সেই মোতাবেক রায় দেন।

মুফাস্‌সিরগণ ঘটনার বিবরণ এভাবে দিয়েছেন যে, দুই লোক দাউদ (আ.)-এর কাছে উপস্থিত হয়। তাদের একজন ছিল ছাগলপালের মালিক ও অপরজন শস্যক্ষেত্রের মালিক। শস্যক্ষেতের মালিক ছাগলপালের মালিকের বিরুদ্ধে দাবী করল যে, তার ছাগপাল রাত্রিকালে আমার শস্যক্ষেতে চড়াও হয়ে সম্পূর্ণ ফসল বিনষ্ট করে দিয়েছে; কিছুই অবশিষ্ট রাখেনি। দাউদ (আ.) রায় দিলেন যে, ছাগলপালের মালিক তার সমস্ত ছাগল শস্যক্ষেতের মালিককে অর্পন করুক। কিন্তু সুলায়মান (আ.) পিতার অনুমতিতে ভিন্ন রায় পেশ করে বললেন, আপনি ছাগপাল শস্যক্ষেতের মালিককে দিয়ে দিন। সে এগুলোর দুধ, পশম ইত্যাদি দ্বারা উপকার লাভ করুক এবং ক্ষেত ছাগলপালের মালিককে অর্পণ করুন। সে তাতে চাষাবাদ করে শস্য উৎপন্ন করবে। যখন শস্যক্ষেত্র ছাগলপালে বিনষ্ট করার পূর্বের অবস্থায় পৌঁছে যাবে তখন শস্যক্ষেত্র উহার মালিককে এবং ছাগপাল ছাগলের মালিককে প্রত্যার্পণ করুন। দাউদ (আ.) এই রায় পছন্দ করে বললেনঃ বেশ এখন এই রায়ই কার্যকর হবে। অতঃপর তিনি উভয়পক্ষকে ডেকে দ্বিতীয় রায় কার্যকর করলেন। [কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

ছোটবেলা থেকেই জ্ঞান এবং প্রজ্ঞায় ভূষিত সুলায়মান (আ.) পরবর্তীতে যথার্থভাবেই পিতার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হন। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলেন, وَ وَرِثَ سُلَيۡمٰنُ دَاوٗد "আর সুলায়মান দাউদের উত্তরাধিকারী হয়েছিল।" (২৭/১৬)

দাউদ (আ.) এর ন্যায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা সুলায়মান (আ.)-কেও বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য দান করেছিলেন, যা অন্য কাউকে দান করেননি। যেমন বায়ু প্রবাহকে তাঁর অনুগত করে দেয়া হয়েছিল, তামাকে তরল ধাতুতে পরিণত করা হয়েছিল, জিনকে তাঁর অধীনস্ত করে দেয়া হয়েছিল,পক্ষীকূলকে অনুগত করা হয়েছিল, পিপীলিকার ভাষা বোঝার ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল, অতুলনীয় সাম্রাজ্য দান করা হয়েছিল এবং প্রাপ্ত অনুগ্রহ রাজির হিসাব না রাখার অনুমতি পেয়েছিলেন তিনি।

তাঁর হুকুম মতো বায়ু তাঁকে তাঁর ইচ্ছামত স্থানে বহন করে নিয়ে যেত। তিনি সদলবলে বায়ুর পিঠে নিজ সিংহাসনে সওয়ার হয়ে দু'মাসের পথ একদিনে পৌঁছে যেতেন। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْر...ٌ

'এবং আমরা সুলায়মানের অধীন করে দিয়েছিলাম বায়ুকে, যা সকালে এক মাসের পথ ও বিকালে এক মাসের পথ অতিক্রম করত...' (সাবা ৩৪/১২)।

তামার ন্যায় শক্ত পদার্থকে আল্লাহ সুলায়মান (আ.)-এর জন্য তরল ধাতুতে পরিণত করেছিলেন। যেমন আল্লাহ বলেন, وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ... 'আমরা তার জন্য গলিত তামার একটি ঝর্ণা প্রবাহিত করেছিলাম...' (সাবা ৩৪/১২)। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, ঐ গলিত ধাতু উত্তপ্ত ছিল না। বরং তা দিয়ে অতি সহজে পাত্রাদি তৈরি করা যেত। সুলায়মান (আ.)-এর পর থেকেই তামা গলিয়ে পাত্রাদি তৈরি করা শুরু হয় বলে কুরতুবী বর্ণনা করেছেন। পিতা দাউদ (আ.)-এর জন্য ছিল লোহা গলানোর মু'জিযা এবং পুত্র সুলায়মান (আ.)-এর জন্য ছিল তামা গলানোর মু'জিযা। আর এজন্যেই আয়াতের শেষে আল্লাহ বলেন,

إِعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْراً وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُور ُ

'হে দাউদ পরিবার! কৃতজ্ঞতা সহকারে তোমরা কাজ করে যাও। বস্তুত আমার বান্দাদের মধ্যে অল্প সংখ্যকই কৃতজ্ঞ।' (সাবা ৩৪/১৩)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা জিনদেরকে তাঁর অধীন করে দিয়েছিলেন। যেমন আল্লাহ বলেন, وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّه... 'আর জিনের মধ্যে কিছুসংখ্যক তার (সুলায়মানের) সম্মুখে কাজ করত তার পালনকর্তার (আল্লাহর) আদেশে...' (সাবা ৩৪/১২)।

অন্যত্র বলা হয়েছে,

وَالشَّيَاطِيْنَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَّغَوَّاصٍ- وَآخَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِي الْأَصْفَادِ

'আর সকল শয়তানকে তার অধীন করে দিলাম, যারা ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী'। 'এবং অন্য আরও অনেককে অধীন করে দিলাম, যারা আবদ্ধ থাকত শৃংখলে।' (ছ্বদ ৩৮/৩৭-৩৮)

বস্তুত জিনেরা সাগরে ডুব দিয়ে তলদেশ থেকে মূল্যবান মণি-মুক্তা, হীরা-জহরত তুলে আনত এবং সুলায়মানের হুকুমে নির্মাণ কাজ সহ যেকোন কাজ করার জন্য সদা প্রস্তুত থাকত। ঈমানদার জিনেরা তো সওয়াবের নিয়তে স্বেচ্ছায় আনুগত্য করত। কিন্তু দুষ্ট

জিনগুলো বেড়ীবদ্ধ অবস্থায় সুলায়মান (আ.)-এর ভয়ে কাজ করত। আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে থাকায় এরা সুলায়মানের কোন ক্ষতি করতে পারত না। বরং সর্বদা তাঁর হুকুম পালনের জন্য প্রস্তুত থাকত।

হযরত সুলায়মান (আ.) একদা তাঁর বিশাল সেনাবাহিনী সহ একটি এলাকা অতিক্রম করছিলেন। ঐ সময় তাঁর সাথে জিন, মানুষ পক্ষীকুল ছিল। যে এলাকা দিয়ে তাঁরা যাচ্ছিলেন সে এলাকায় বালির ঢিবি সদৃশ পিপীলিকাদের বহু বসতঘর ছিল। সুলায়মান বাহিনীকে আসতে দেখে পিপীলিকাদের সর্দার তাদেরকে বলল, তোমরা শীঘ্রই পালাও। নইলে পাদপিষ্ট হয়ে শেষ হয়ে যাবে। সুলায়মান (আ.) পিপীলিকাদের এই বক্তব্য শুনতে পেলেন। এরপরের ঘটনা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কুরআনে বর্ণনা করে বলেছেন,
فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَ قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ عَلٰى وَالِدَيَّ
وَ اَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَ اَدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ
“তারপর সুলাইমান তার কথায় মুচকি হাসলো এবং বলল, ‘হে আমার রব, তুমি আমার প্রতি ও আমার পিতা-মাতার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছো তার জন্য আমাকে তোমার শুকরিয়া আদায় করার তাওফীক দাও। আর আমি যাতে এমন সৎকাজ করতে পারি যা তুমি পছন্দ কর। আর তোমার অনুগ্রহে তুমি আমাকে তোমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করো।’ (২৭/১৯)

অর্থাৎ সুলায়মান (আ.) কেবল পাখির ভাষা নয়, বরং সকল জীবজন্তু এমনকি ক্ষুদ্র পিঁপড়ার কথাও বুঝতেন। এজন্য তিনি মোটেই গর্ববোধ না করে বরং আল্লাহর অনুগ্রহের প্রতি শুকরিয়া আদায় করেন এবং নিজেকে যাতে আল্লাহ অন্যান্য সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করেন সে প্রার্থনা করেন।

সুলায়মান (আ.) আল্লাহর হুকুমে পক্ষীকুলের আনুগত্য লাভ করেন। একদিন তিনি পক্ষীকুলকে ডেকে একত্রিত করেন ও তাদের ভালো-মন্দ খোঁজ-খবর নেন। তখন দেখতে পেলেন যে, ‘হুদহুদ’ পাখিটা নেই। তিনি অনতিবিলম্বে তাকে ধরে আনার জন্য কড়া নির্দেশ জারি করলেন। সাথে তার অনুপস্থিতির উপযুক্ত কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করলেন। উল্লেখ্য যে, ‘হুদহুদ’ এক জাতীয় ছোট্ট পাখির নাম। যা পক্ষীকুলের মধ্যে অতীব ক্ষুদ্র ও দুর্বল এবং যার সংখ্যাও দুনিয়াতে খুবই কম। বর্ণিত আছে যে,

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রা.) একদা নও মুসলিম ইহুদী পন্ডিত আব্দুল্লাহ বিন সালাম (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, এতসব পাখি থাকতে বিশেষভাবে 'হুদহুদ' পাখির খোঁজ নেওয়ার কারণ কি ছিল? জওয়াবে তিনি বলেন, সুলায়মান (আ.) তাঁর বিশাল বাহিনীসহ ঐসময় এমন এক অঞ্চলে ছিলেন, যেখানে পানি ছিল না। আল্লাহ তা'আলা হুদহুদ পাখিকে এই বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যে, সে ভূগর্ভের বস্তু সমূহকে এবং ভূগর্ভে প্রবাহিত পানি উপর থেকে দেখতে পায়। হযরত সুলায়মান (আ.) হুদহুদকে এজন্যেই বিশেষভাবে খোঁজ করছিলেন যে, এতদঞ্চলে কোথায় মরুগর্ভে পানি লুকায়িত আছে, সেটা জেনে নিয়ে সেখানে জিন দ্বারা খনন করে যাতে দ্রুত পানি উত্তোলনের ব্যবস্থা করা যায়।

সুলায়মান (আ.)-এর শাম ও ইরাক সাম্রাজ্যের পার্শ্ববর্তী ইয়ামান তথা 'সাবা' রাজ্যের রাণী ছিলেন বিলক্বীস। দুনিয়াবী দিক দিয়ে এই 'সাবা' সাম্রাজ্য খুবই সমৃদ্ধ এবং শান-শওকতে পূর্ণ ছিল। হুদহুদ পাখি তাদের সম্পর্কে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর নিকটে খবর দেয়। তার বর্ণিত প্রতিবেদনটি ছিল কুরআনের ভাষায় নিম্নরূপ-

إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ- وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لاَ يَهْتَدُونَ

'আমি এক মহিলাকে সাবা বাসীদের উপরে রাজত্ব করতে দেখেছি। তাকে সবকিছুই দেওয়া হয়েছে এবং তার একটা বিরাট সিংহাসন আছে। আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করছে। শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যাবলীকে সুশোভিত করেছে। অতঃপর তাদেরকে সত্যপথ থেকে নিবৃত্ত করেছে। ফলে তারা সঠিক পথ প্রাপ্ত হয় না।' (নামল ২৭/২৩-২৪)।

নবী সুলাইমান (আ.) তাদের হিদায়াতের জন্য হুদহুদ মারফত একটি পত্র পাঠান। বিলক্বীস বলল, হে সভাসদ বর্গ! আমাকে একটি মহিমান্বিত পত্র দেওয়া হয়েছে। সেই পত্র সুলায়মানের পক্ষ হতে এবং তা হলো পরম করুণাময় আল্লাহর নামে। আমার মোকাবেলায় তোমরা শক্তি প্রদর্শন করো না এবং বশ্যতা স্বীকার করে আমার নিকটে উপস্থিত হও। বিলক্বীস বলল, হে আমার পারিষদ বর্গ! আমাকে আমার কাজে পরামর্শ দিন। আপনাদের উপস্থিতি ব্যতিরেকে আমি কোন কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না। 'তারা বলল, আমরা শক্তিশালী এবং কঠোর যোদ্ধা। এখন সিদ্ধান্ত আপনার হাতে। অতএব

ভেবে দেখুন আপনি আমাদের কি আদেশ করবেন। রাণী বলল, রাজা-বাদশাহরা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে, তখন তাকে বিপর্যস্ত করে দেয়। অতএব আমি তাঁর নিকটে কিছু উপঢৌকন পাঠাই। অতঃপর যখন দূত সুলায়মান (আ.)-এর কাছে আগমন করল, তখন তিনি বললেন, তোমরা কি ধন-সম্পদ দ্বারা আমাকে সাহায্য করতে চাও? আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন, তা তোমাদের দেয়া বস্তু থেকে অনেক উত্তম। বরং তোমরাই তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে সুখে থাকো। ফিরে যাও তাদের কাছে। এখন অবশ্যই আমরা তাদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী সহ আগমন করব, যার মোকাবেলা করার শক্তি তাদের নেই। অতঃপর সুলায়মান (আ.) বললেন, হে আমার পারিষদবর্গ! তারা আত্মসমর্পণ করে আমার কাছে আসার পূর্বে কে আছো বিলক্বীসের সিংহাসন আমাকে এনে দেবে? জনৈক জ্বিন বলল, আপনি আপনার স্থান থেকে ওঠার পূর্বেই আমি তা এনে দেব এবং আমি একাজে শক্তিবান ও বিশ্বস্ত। কিন্তু কিতাবের জ্ঞান যার ছিল সে বলল, তোমার চোখের পলক ফেলার পূর্বেই আমি তা এনে দিব। অতঃপর সুলায়মান (আ.) যখন তা সামনে রক্ষিত দেখলেন, তখন বললেন, এটা আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি শুকরিয়া আদায় করি, না অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

সুলায়মান বলল, বিলক্বীসের সিংহাসনের আকৃতি বদলিয়ে দাও, দেখবো সে সঠিক বস্তু চিনতে পারে কিনা। অতঃপর যখন বিলক্বীস এসে গেল, তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার সিংহাসন কি এরূপই? সে বলল, মনে হয় এটা সেটিই হবে। তাকে বলা হলো, প্রাসাদে প্রবেশ করুন। অতঃপর যখন সে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করল, তখন ধারণা করল যে, এটা স্বচ্ছ গভীর জলাশয়। ফলে সে তার পায়ের গোছা খুলে ফেলল। সুলায়মান (আ.) বললেন, এটা তো স্বচ্ছ স্ফটিক নির্মিত প্রাসাদ। বিলক্বীস বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমি তো নিজের প্রতি যুলুম করেছি। আমি সুলায়মানের সাথে বিশ্বজাহানের পালনকর্তা আল্লাহর নিকটে আত্মসমর্পণ করলাম। (২৭/২৭-৪৪)।

নবী সুলায়মান (আ.)–এর সময়ে হারুত ও মারুত নামক দুই ফেরেশতা বাবেল শহরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। হারুত–মারুত কিছু লোককে জাদু শিখিয়েছিলেন। শেখানোর শর্ত ছিল, সেই জাদু কারও ওপর প্রয়োগ করা যাবে না। জাদুবিদ্যা যে আসলে মন্দ, সবাইকে এটা শেখানোর জন্যই তাঁরা এসেছিলেন। নবীরা মু’জিযা দেখান। মু’জিযা জাদু নয়।

কুরআনে সুরা বাকারায় আছে ‘আর সুলায়মানের রাজত্বে শয়তানেরা যা আওড়াতো, তারা (সাবাবাসীরা) তা মেনে চলত। সুলায়মান অবিশ্বাস করেনি, বরং শয়তানেরাই অবিশ্বাস করেছিল। তারা মানুষকে শিক্ষা দিত (সেই) জাদু যা বাবেল শহরের দুই ফেরেশতা হারুত ও মারুতের ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল । তাই আমরা তো তোমাদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। তোমরা অবিশ্বাস কোরো না—এই না বলে তারা কোনো মানুষকে শিক্ষা দিত না। এ-দুজনের কাছ থেকে তারা এখন বিষয় শিক্ষা করত, যা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারত, তবু আল্লাহর নির্দেশ ছড়া কারও কোনো ক্ষতি তারা করতে পারত না। তারা যা শিক্ষা করত তা তাদের ক্ষতিসাধনই করত, আর কোনো উপকারে আসত না। আর তারা ভালো করেই জানত যে যে-কেউ তা কিনবে পরকালে তার কোনো অংশ নেই । আর যদি তারা জানত, তারা যার বিনিময়ে নিজেদের বিক্রি করেছিল তা কত নিকৃষ্ট! আর তারা যদি বিশ্বাস করত ও আল্লাহকে ভয় করত তবে নিশ্চয় তারা আল্লাহ কাছে ভালো পুরস্কারই পেত, জানতো। যদি তারা জানতো।’ (সুরা বাকারা, আয়াত: ১০২-৩)

বায়তুল মুক্কাদ্দাসের নির্মাণ সর্বপ্রথম ফেরেশতাদের মাধ্যমে অথবা আদম (আ.)-এর কোনো সন্তানের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় কা‘বাগৃহ নির্মাণের চল্লিশ বছর পরে। অতঃপর স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে হযরত ইয়াকুব (আ.) তা পুনঃনির্মাণ করেন। তার প্রায় হাজার বছর পরে দাউদ (আ.) তার পুনঃনির্মাণ শুরু করেন এবং সুলায়মান (আ.)-এর হাতে তা সমাপ্ত হয়। কিন্তু মূল নির্মাণ কাজ শেষ হলেও আনুসঙ্গিক কিছু কাজ তখনও বাকি ছিল। এমন সময় হযরত সুলায়মান (আ.)-এর মৃত্যুকাল ঘনিয়ে এলো। এই কাজগুলি অবাধ্যতাপ্রবণ জিনদের উপরে ন্যস্ত ছিল। তারা সুলায়মান (আ.)-এর ভয়ে কাজ করত। তারা তাঁর মৃত্যু সংবাদ জানতে পারলে কাজ ফেলে রেখে পালাতো। ফলে নির্মাণ কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যেত। তখন সুলায়মান (আ.) আল্লাহর নির্দেশে মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হয়ে তাঁর কাঁচ নির্মিত মেহরাবে প্রবেশ করলেন। যাতে বাইরে থেকে ভিতরে সবকিছু দেখা যায়। তিনি বিধানানুযায়ী ইবাদতের উদ্দেশ্যে লাঠিতে ভর করে দাঁড়িয়ে গেলেন, যাতে রূহ বেরিয়ে যাবার পরেও লাঠিতে ভর দিয়ে দেহ স্বস্থানে দাঁড়িয়ে থাকে। সেটাই হলো। আল্লাহর হুকুমে তাঁর দেহ উক্ত লাঠিতে ভর করে এক বছর দাঁড়িয়ে থাকলো। দেহ পচলো না, খসলো না বা পড়ে গেল না। জিনেরা ভয়ে কাছে যায়নি। ফলে তারা হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে কাজ শেষ করে ফেলল। এভাবে কাজ সমাপ্ত হলে আল্লাহর

হুকুমে কিছু উই পোকার সাহায্যে লাঠি ভেঙ্গে দেওয়া হয় এবং সুলায়মান (আ.)-এর লাশ মাটিতে পড়ে যায়। উক্ত কথাগুলি আল্লাহ বলেন নিম্নোক্ত ভাবে-

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلاَّ دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوْا فِي الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ

'অতঃপর যখন আমরা সুলায়মানের মৃত্যু ঘটালাম, তখন ঘুনপোকাই জিনদেরকে তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত করল। সুলায়মানের লাঠি খেয়ে যাচ্ছিলো। অতঃপর যখন তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন, তখন জিনেরা বুঝতে পারলো যে, যদি তারা অদৃশ্য বিষয় জানতো, তাহলে তারা (মসজিদ নির্মাণের) এই হাড়ভাঙ্গা খাটুনির আযাবের মধ্যে আবদ্ধ থাকতো না' *(সাবা ৩৪/১৪)*।

যাকারিয়া ও ইয়াহইয়া (আ'লাইহিস সালাম)

যাকারিয়া ও ইয়াহইয়া (আ.) সুলায়মান (আ.) পরবর্তী দুই নবী পরস্পরে পিতা-পুত্র ছিলেন এবং তাঁরা বায়তুল মুক্বাদ্দাসের অধিবাসী ছিলেন। ইয়াহইয়া (আ.) ছিলেন বয়সে পরবর্তী নবী ঈসা (আ.)-এর ছয় মাসের বড়। তিনি ঈসা (আ.)-এর ছয় মাস পূর্বেই দাওয়াতের কাজ শুরু করেন। হযরত যাকারিয়া ও ইয়াহ্ইয়া (আ.) সম্পর্কে ৪টি সূরার ২২টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে সূরা আন'আমে কেবল ১৮জন নবীর নামের তালিকায় তাঁদের নাম উল্লেখিত হয়েছে। বাকি অন্য সূরাগুলিতে খুবই সংক্ষেপে কেবল ইয়াহ্ইয়া (আ.)-এর জন্ম বৃত্তান্ত সম্পর্কে বর্ণনা এসেছে।

যাকারিয়া (আ.) সম্পর্কে কুরআনে কেবল এতটুকু বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি মারইয়ামের লালন-পালনকারী ছিলেন। এ বিষয়ে আল্লাহ সূরা আলে-ইমরানে উল্লেখ করেন, "(মারইয়াম বললেন) আমার গর্ভের সন্তানকে আমি আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করে দিলাম। তিনি ধারণা করেছিলেন যে, তাঁর একটি পুত্র সন্তান হবে এবং তাকে তিনি আল্লাহর ঘর বায়তুল মুক্বাদ্দাসের খিদমতে নিয়োগ করবেন। কিন্তু পুত্রের স্থলে কন্যা সন্তান অর্থাৎ মারিয়াম জন্মগ্রহণ করলে তিনি হতাশ হয়ে পড়েন। আল্লাহ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, لَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنْثَى 'এই কন্যার মত কোন পুত্রই নেই" (আলে-ইমরান ৩/৩৬)।

এক্ষণে যেহেতু মানত অনুযায়ী তাকে মসজিদের খেদমতে উৎসর্গ করতে হবে। কিন্তু সেখানে তার অভিভাবক কে হবে? ঐসময় (সম্ভবত) মারইয়ামের পিতা জীবিত ছিলেন

না। বংশের লোকেরা সবাই এই পবিত্র মেয়েটির অভিভাবক হতে চায়। ফলে অবশেষে লটারীর ব্যবস্থা হয়। সেখানে মারইয়ামের খালু এবং তৎকালীন নবী হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর নাম আসে। এ ঘটনাটিই আল্লাহপাক তাঁর শেষনবীকে শুনাচ্ছেন নিম্নোক্ত ভাষায়-

ذَلِكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُون أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ

‘(মারইয়ামের বিষয়টি) গায়েবী সংবাদ, যা আমরা আপনাকে প্রত্যাদেশ করছি। আপনি তো তাদের কাছে ছিলেন না, যখন তারা লটারীর মাধ্যমে প্রতিযোগিতা করছিল এ ব্যাপারে যে, কে মারইয়ামকে প্রতিপালন করবে? আর আপনি তাদের কাছে ছিলেন না, যখন তারা এ বিষয়ে ঝগড়া করছিল’ (আলে ইমরান ৩/৪৪)। ‘অতঃপর আল্লাহ তাকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে অর্পণ করলেন।’ (আলে ইমরান ৩/৩৭)

মারইয়াম মসজিদ সংলগ্ন মেহরাবে থাকতেন। যাকারিয়া (আ.) তাকে নিয়মিত দেখাশুনা করতেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ছিল এই যে, যখনই তিনি মেহরাবে আসতেন, তখনই সেখানে নতুন নতুন তাজা ফল-ফলাদি ও খাদ্য-খাবার দেখতে পেতেন। তিনি একদিন এ বিষয়ে মারইয়ামকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, هُوَ مِنْ عِندِ الله ‘এসব আল্লাহর নিকট থেকে আসে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান করেন।’ (আলে ইমরান ৩/৩৭)

শিশু মারইয়ামের উপরোক্ত কথা থেকেই নিঃসন্তান বৃদ্ধ যাকারিয়ার মনে আশার সঞ্চার হয় এবং তিনি চিন্তা করেন যে, যিনি ফলের মৌসুম ছাড়াই মারইয়ামকে তাজা ফল সরবরাহ করেছেন, নিশ্চয়ই তিনি বৃদ্ধ দম্পতিকে সন্তান দান করবেন। অতঃপর তিনি বুকে সাহস বেঁধে আল্লাহর নিকটে প্রার্থনা করেন। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন,

ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا- إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاء خَفِيًّا- قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا- وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا- يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا

‘এটি আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহের বিবরণ তার বান্দা যাকারিয়ার প্রতি। যখন সে তার পালনকর্তাকে আহবান করেছিল নিভৃতে। সে বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমার

অস্থি দুর্বল হয়ে গেছে এবং বার্ধক্যের কারণে মস্তক শ্বেত-শুভ্র হয়ে গেছে। হে প্রভু! আপনাকে ডেকে আমি কখনো নিরাশ হইনি। আমি ভয় করি আমার পরবর্তী বংশধরের। অথচ আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। অতএব আপনি নিজের পক্ষ থেকে আমাকে একজন উত্তরাধিকারী দান করুন। সে আমার স্থলাভিষিক্ত হবে এবং উত্তরাধিকারী হবে ইয়াকুব-বংশের এবং হে প্রভু! আপনি তাকে করুন সদা-সন্তুষ্ট।' (মারইয়াম ১৯/২-৬)

জবাবে আল্লাহ বললেন, 'হে যাকারিয়া! আমি তোমাকে একটি পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি। তার নাম হবে ইয়াহইয়া। ইতিপূর্বে এই নামে আমি কারু নামকরণ করিনি। সে বলল, হে আমার পালনকর্তা! কেমন করে পুত্র সন্তান হবে? অথচ আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। আর আমিও বার্ধক্যের শেষপ্রান্তে উপনীত। তিনি বললেন, এভাবেই হবে। তোমার প্রভু বলে দিয়েছেন যে, এটা আমার জন্য খুবই সহজ। আমি তো ইতিপূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করেছি, যখন তুমি কিছুই ছিলে না। সে বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে একটি নিদর্শন প্রদান করুন। তিনি বললেন, তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি (সুস্থ অবস্থায়) একটানা তিন দিন লোকজনের সাথে কথাবার্তা বলতে পারবে না। অতঃপর সে কক্ষ থেকে বের হয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে এল এবং ইঙ্গিতে তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহকে স্মরণ করতে বলল।' (মারইয়াম ১৯/৭-১১)

অতঃপর ইয়াহইয়া সম্পর্কে আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا- وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا- وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّاراً عَصِيًّا- وَسَلاَمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا

'হে ইয়াহ্ইয়া! দৃঢ়তার সাথে এই গ্রন্থ (তাওরাত) ধারণ কর। আর আমরা তাকে শৈশবেই প্রজ্ঞা দান করেছিলাম এবং নিজের পক্ষ থেকে তাকে বিশেষভাবে দান করেছিলাম কোমলতা ও পবিত্রতা। এবং সে ছিল অতীব তাক্বওয়াশীল। সে ছিল পিতা-মাতার অনুগত এবং সে উদ্ধত ও অবাধ্য ছিল না। তার উপরে শান্তি, যেদিন সে জন্মগ্রহণ করেছে, যেদিন সে মৃত্যুবরণ করেছে এবং যেদিন সে জীবিতাবস্থায় পুনরুত্থিত হবে।' (মারইয়াম ১৯/১২-১৫)

যাকারিয়া ও ইয়াহইয়া (আ.) বায়তুল মুক্বাদ্দাসের সন্নিকটে বসবাস করতেন এবং তাঁরা বনু ইসরাঈল বংশের নবী ছিলেন। ইয়াহইয়া (আ.) নবী হন। তিনি শৈশব থেকেই

প্রজ্ঞাসম্পন্ন, কোমল হৃদয় ও পবিত্র ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি চিরকুমার ছিলেন। তিনি পিতা-মাতার অতীব অনুগত এবং আল্লাহভীরু। ইহুদীদের চরিত্র পরে এতই কলুষিত ও উদ্ধত হয় যে, তাদের কোনো বিধান পছন্দ না হলে তারা তাদের নবীকে হত্যা করে ফেলতো। এজন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কুরআনে বনী ইসরাঈলদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন,

فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْۢبِيَآءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

"(হে বনী ইসরাঈল), তোমরা যদি মু'মিন হয়ে থাকো, তবে কেন তোমরা তোমাদের নবীদেরকে হত্যা করতে?" (২/৯১)

সাইয়্যিদিনা ইয়াহইয়া (আ.) এর সময়ে একজন অত্যাচারী বাদশাহ ছিল; যে তার আপন ভাতিজিকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু তাওরাত অনুযায়ী এমন বিয়ে অবৈধ থাকায় ইয়াহইয়া (আ.) এই কাজের বিরোধিতা করলেন এবং তাঁর বিরোধিতার সাথে সুর মিলিয়ে আরও অনেকেই বিরোধিতা শুরু করল। এ কারণেই তৎকালীন রাজা ইয়াহইয়া (আ.)-কে বন্দী করল এবং জোরপূর্বক ভাতিজিকে বিয়ে করেছিল। এই পাষণ্ড রাজা কারাগারে আল্লাহর নবী ইয়াহইয়া (আ.)-কে শিরচ্ছেদ করে হত্যা করেছিল এবং তাঁর খণ্ডিত মাথা সে তার স্ত্রীকে উপহার দিয়েছিল। হযরত ইয়াহইয়া (আ.) ছিলেন বনী ইসরাঈলদের কাছে প্রেরিত সর্বশেষ নিহত নবী। অর্থাৎ পরবর্তীতে আর এমন কোনো নবী আসেননি যিনি নিহত হয়েছেন।

ঈসা (আ'লাইহিস সালাম)

হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার একজন বান্দা ও তাঁর প্রেরিত রাসূল। তিনি বনী ইসরাঈলের সর্বশেষ নবী। আল্লাহর কুদরতে কোনো পৈতৃক সম্পর্ক ছাড়াই কুমারী মায়ের গর্ভে ফিলিস্তিনে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। আসমানি প্রসিদ্ধ চার কিতাবের মধ্যে ইনজিল তার ওপর নাযিল হয়। হযরত ঈসা (আ.) আগের সকল নবী ও আসমানি কিতাবের সত্যায়নকারী এবং সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর আগমনের সুসংবাদ দান করেন।

সাইয়্যিদিনা যাকারিয়া (আ.)-এর ঘটনায় ঈসা (আ.) এর মাতা মারইয়াম (আ.)-এর বায়তুল মুকাদ্দাসে খিদমতের ঘটনা আলোচিত হয়েছে। মেহরাবে অবস্থান করে মারইয়াম বায়তুল মুক্বাদ্দাসের খিদমত করতে থাকেন। সম্মানিত নবী ও মারইয়ামের বয়োবৃদ্ধ খালু যাকারিয়া (আ.) সর্বদা তাকে দেখাশুনা করতেন। মেহরাবের উত্তর-পূর্বদিকে সম্ভবত খেজুর বাগান ও ঝর্ণাধারা ছিল। যেখানে মারিয়াম পর্দা টাঙিয়ে মাঝে-মধ্যে পায়চারি করতেন। অভ্যাসমত তিনি উক্ত নির্জন স্থানে একদিন পায়চারি করছিলেন। এমন সময় হঠাৎ মানুষের বেশে সেখানে জিবরীল (আ.) উপস্থিত হন। স্বাভাবিকভাবেই তাতে মারইয়াম ভীত হয়ে পড়েন। এ বিষয়ে কুরআনী বর্ণনা নিম্নরূপ-

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَاناً شَرْقِيًّا- فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَاباً فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا- قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا- قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا- قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا- قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا

(হে মুহাম্মাদ!) 'আপনি এই কিতাবে মারইয়ামের কথা বর্ণনা করুন। যখন সে তার পরিবারের লোকজন হতে পৃথক হয়ে পূর্বদিকে একস্থানে আশ্রয় নিল। অতঃপর সে তাদের থেকে আড়াল করার জন্য পর্দা টাঙিয়ে নিল। অতঃপর আমরা তার নিকটে আমাদের 'রূহ' (অর্থাৎ জিবরীলকে) প্রেরণ করলাম। সে তার কাছে গিয়ে পূর্ণাঙ্গ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল। 'মারইয়াম বলল, আমি তোমার থেকে করুণাময় আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যদি তুমি আল্লাহভীরু হও। সে বলল, আমি তো কেবল তোমার প্রভুর প্রেরিত। এজন্য যে, আমি তোমাকে একটি পবিত্র পুত্র সন্তান দান করে যাব। 'মারইয়াম বলল, কিভাবে আমার পুত্র সন্তান হবে? অথচ কোন মানুষ আমাকে স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যভিচারিণী নই। সে বলল, এভাবেই হবে। তোমার পালনকর্তা বলেছেন, এটা আমার জন্য সহজ ব্যাপার এবং আমরা তাকে (ঈসাকে) মানবজাতির জন্য একটা নিদর্শন ও আমাদের পক্ষ হতে বিশেষ অনুগ্রহরূপে পয়দা করতে চাই। তাছাড়া এটা (পূর্ব থেকেই) নির্ধারিত বিষয়' (মারইয়াম ১৯/১৬-২১)। অতঃপর জিবরীল (আ.) মারইয়ামের মুখে অথবা তাঁর পরিহিত জামায় ফুঁক মারলেন এবং তাতেই তাঁর গর্ভ সঞ্চার হলো। (আম্বিয়া ২১/৯১; তাহরীম ৬৬/১২)

আল্লাহ তায়ালা হজরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে বলেন, "যখন ফেরেশতাগণ বলল, হে মারইয়াম! আল্লাহ তোমাকে তাঁর এক বাণীর সুসংবাদ দিচ্ছেন, যার নাম হলো মসীহ-

ঈসা ইবনে মারইয়াম; দুনিয়া ও আখিরাতে তিনি মহাসম্মানের অধিকারী এবং আল্লাহর ঘনিষ্ঠদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। যখন তিনি মায়ের কোলে থাকবেন এবং পূর্ণ বয়স্ক হবেন, তখন তিনি মানুষের সঙ্গে কথা বলবেন। আর তিনি সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। তিনি বললেন, পরওয়ারদেগার! কেমন করে আমার সন্তান হবে; আমাকে তো কোনো পুরুষ-মানুষ স্পর্শ করেনি। বললেন, এভাবেই। আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কোনো কাজ করার জন্য ইচ্ছা করেন তখন বলেন যে, 'হয়ে যাও', অমনি তা হয়ে যায়।" (৩/৪৫-৪৭)

আল্লাহর ইশারায় মারইয়াম (আ.) কোনো পুরুষের স্পর্শ ছাড়া সন্তান প্রসব করলেন। এর পরের ঘটনা আমরা সরাসরি কুরআন থেকে বিবৃত করব। আল্লাহ বলেন,

فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوْا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا- يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوْكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا

'অতঃপর মারিয়াম তার সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হলো। তারা বলল, হে মারইয়াম! তুমি একটা আশ্চর্য বস্তু নিয়ে এসেছো। হে হারূণের বোন! তোমার পিতা কোন অসৎ ব্যক্তি ছিলেন না কিংবা তোমার মাতাও কোন ব্যভিচারিণী মহিলা ছিলেন না' (১৯/২৭-২৮)। কওমের লোকদের এ ধরনের কথা ও সন্দেহের জওয়াবে নিজে কিছু না বলে বিবি মারিয়াম তার সদ্য প্রসূত সন্তানের দিকে ইশারা করলেন। অর্থাৎ একথার জবাব সেই-ই দিবে। কেননা সে আল্লাহর দেওয়া এক অলৌকিক সন্তান, যা কওমের লোকেরা জানে না। আল্লাহ বলেন, 'অতঃপর মারইয়াম ঈসার দিকে ইঙ্গিত করল। তখন লোকেরা বলল, কোলের শিশুর সাথে আমরা কিভাবে কথা বলব? ঈসা তখন বলে উঠল, আমি আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব (ইনজীল) প্রদান করেছেন এবং আমাকে নবী করেছেন। আমি যেখানেই থাকি, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। তিনি আমাকে জোরালো নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন জীবিত থাকি, ততদিন স্বলাত ও যাকাত আদায় করতে এবং আমার মায়ের অনুগত থাকতে। আল্লাহ আমাকে উদ্ধত ও হতভাগা করেননি। আমার প্রতি শান্তি যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন আমি মৃত্যুবরণ করব এবং যেদিন জীবিত পুনরুত্থিত হব।' (১৯/২৯-৩৩)

ঈসার উপরোক্ত বক্তব্য শেষ করার পর সংশয়বাদী ও বিতর্ককারী লোকদের উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলেন, ذَٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِيْ فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ "ইনিই হলেন মারইয়াম পুত্র ঈসা। আর এটাই হলো সত্যকথা, যে বিষয়ে লোকেরা (অহেতুক) বিতর্ক করে থাকে।" (১৯/৩৪)।

ঈসা (আ.) মানুষকে আল্লাহর একত্ববাদের দিকে আহ্বান করেছেন। তাদের মহান রবের একনিষ্ঠ পথ অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআ'লা বলেন, "ঈসা যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ আগমন করল, তখন বলল, আমি তোমাদের কাছে প্রজ্ঞা নিয়ে এসেছি এবং তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছো, তা ব্যক্ত করার জন্য এসেছি। অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার কথা মানো। নিশ্চয়ই আল্লাহই আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক। অতএব, তাঁর ইবাদত করো। এটা হলো সরল পথ।" (৪৩/৬৩-৬৪)

আল্লাহ তায়ালা তাঁর ঈসা (আ.)-কে বিশেষ কিছু মু'জিযা দান করছিলেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে বলছেন, "তুমি মানুষের সঙ্গে কথা বলতে, দোলনায় এবং পরিণত বয়সেও এবং যখন আমি তোমাকে গ্রন্থ, প্রগাঢ় জ্ঞান, তাওরাত ও ইঞ্জিল শিক্ষা দিয়েছিলাম এবং যখন তুমি কাদামাটি দিয়ে পাখির প্রতিকৃতির মতো প্রতিকৃতি নির্মাণ করতে আমার আদেশে। অতঃপর তুমি তাতে ফুঁ দিতে; ফলে তা আমার আদেশে পাখি হয়ে যেত এবং তুমি আমার আদেশে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে নিরাময় করে দিতে এবং যখন তুমি আমার আদেশে মৃতদের বের করে দাঁড় করিয়ে দিতে এবং যখন আমি বনী-ইসরাঈলকে তোমাদের থেকে নিবৃত্ত রেখেছিলাম, যখন তুমি তাদের কাছে প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিলে। অতঃপর তাদের মধ্যে যারা কাফির ছিল, তারা বলল, এটা প্রকাশ্য জাদু ছাড়া কিছুই নয়। আর যখন আমি হাওয়ারিদের মনে জাগ্রত করলাম যে আমার প্রতি এবং আমার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো, তখন তারা বলতে লাগল, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে আমরা আনুগত্যশীল।" (৫/১১০-১১১)

ঈসা (আ.) যখন তাঁর যুগের মানুষদের আল্লাহর একত্ববাদের দিকে আহ্বান করছিলেন তখন ইহুদীরা তাঁর উপর খুব ক্ষিপ্ত হয় এবং তাঁকে অনেক কষ্ট দেয়। পাশাপাশি হত্যার ষড়যন্ত্রও করে। এ হীন উদ্দেশ্যে তারা ঈসা (আ.)-এর ঘর অবরোধ করে এবং তাঁকে

হত্যা করার জন্য জনৈক ব্যক্তিকে পাঠায়। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা ঈসা (আ.)-কে জীবিত অবস্থায় আসমানে তুলে নেন। আর ঐ ব্যক্তিকে ঈসা (আ.)-এর আকৃতি দান করেন। সে হজরত ঈসা (আ.)-কে কিছু করতে না পেরে বাইরে চলে আসে। অপেক্ষমান লোকজন তাঁকে ঈসা (আ.) মনে করে পাকড়াও করে এবং তাকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করে। এরপর তারা ঈসা (আ.)-কে হত্যা করেছে বলে প্রচার করে। বর্তমানে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মাঝেও এই ধারণা প্রচলিত রয়েছে। অথচ আল্লাহ তায়ালা এই ধারণাকে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করেছেন।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে- 'আর তাদের এ কথা বলার কারণে যে আমরা মারইয়াম পুত্র ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি, যিনি ছিলেন আল্লাহর রাসুল। অথচ তারা না তাকে হত্যা করেছে, আর না শূলীতে চড়িয়েছে, বরং তারা এক রকম ধাঁধায় পতিত হয়েছিল। বস্তুত তারা এ ব্যাপারে নানা রকম কথা বলে, তারা এ ক্ষেত্রে সন্দেহের মাঝে পড়ে আছে, শুধু অনুমান করা ছাড়া তারা এ বিষয়ে কোনো খবরই রাখে না। আর নিশ্চয়ই তারা তাকে হত্যা করেনি, বরং আল্লাহ তাকে উঠিয়ে নিয়েছেন নিজের কাছে। আর আল্লাহ হচ্ছেন মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।” (৪/১৫৭-১৫৮)

মূসা (আঃ)-এর অনুসারী হওয়ার দাবীদার ইহুদীরা তাঁকে নবী বলেই স্বীকার করেনি। অত্যন্ত লজ্জাষ্করভাবে তারা তাঁকে জনৈক ইউসুফ মিস্ত্রীর জারজ সন্তান বলে আখ্যায়িত করেছে (নাউযুবিল্লাহ)। অন্যদিকে ঈসা (আ.)-এর ভক্ত ও অনুসারী হবার দাবীদার খৃষ্টানরা বাড়াবাড়ি করে তাঁকে আল্লাহর পুত্র বানিয়েছে। (৯/৩০)

অথচ এরূপ ধারণা পোষণকারীদের আল্লাহ দ্ব্যর্থহীনভাবে ‘কাফের’ বলে ঘোষণা করেছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কুরআনে বলেন,

لَقَدۡ كَفَرَ الَّذِيۡنَ قَالُوۡۤا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الۡمَسِيۡحُ ابۡنُ مَرۡيَمَ ؕ وَ قَالَ الۡمَسِيۡحُ يٰبَنِىۡۤ اِسۡرَآءِيۡلَ اعۡبُدُوا اللّٰهَ رَبِّىۡ وَ رَبَّكُمۡ ؕ اِنَّهٗ مَنۡ يُّشۡرِكۡ بِاللّٰهِ فَقَدۡ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيۡهِ الۡجَنَّةَ وَ مَاۡوٰىهُ النَّارُ ؕ وَ مَا لِلظّٰلِمِيۡنَ مِنۡ اَنۡصَارٍ

“তারা অবশ্যই কুফরী করেছে যারা বলে, মারইয়াম পুত্র মাসীহই হচ্ছেন আল্লাহ। মাসীহ তো বলেছিল, হে বনী ইসরাঈল! তোমরা আল্লাহর ‘ইবাদাত কর যিনি আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে অংশীস্থাপন করে তার জন্য আল্লাহ অবশ্যই জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন আর তার আবাস হল জাহান্নাম। যালিমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই।” (৫/৭২)

অসংখ্য হাদীসের আলোকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, কিয়ামতের আগে ঈসা (আ.) শেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর উম্মাত হিসেবে আবার পৃথিবীতে আসবেন। কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন, وَ اِنۡ مِّنۡ اَهۡلِ الۡکِتٰبِ اِلَّا لَیُؤۡمِنَنَّ بِهٖ قَبۡلَ مَوۡتِهٖ ۚ وَ یَوۡمَ الۡقِیٰمَۃِ یَکُوۡنُ عَلَیۡهِمۡ شَهِیۡدًا "কিতাবীদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তার মৃত্যুর পূর্বে তার প্রতি ঈমান আনবে না এবং কিয়ামতের দিনে সে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হবে।" (৪/১৫৯)

উপরোক্ত আয়াতের দু'টি ব্যাখ্যা রয়েছে। প্রথম ব্যাখ্যা হলো, প্রত্যেক ইহুদীই তার অন্তিম মুহূর্তে যখন পরকালের দৃশ্যাবলি অবলোকন করবে, তখন ঈসা (আ.)-এর নবুয়াতের সত্যতা উপলব্ধি করবে। কিন্তু তখনকার ঈমান তাদের কোনো উপকারে আসবে না। এর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হলো, কিয়ামতের নিকটবর্তী যুগে ঈসা (আ.) আবার পৃথিবীতে আগমন করবেন। তখন ইহুদী-খ্রিস্টানরা মুসলমানদের মতো বিশুদ্ধ বিশ্বাস নিয়ে ঈমানদার হবে। আর যারা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবে, তাদের নিশ্চিহ্ন করা হবে। (মা'আরেফুল কোরআন)
ঈসা (আ.)-এর পর থেকে শেষনবীর আবির্ভাব পর্যন্ত প্রায় ছয়শো বছর নবী আগমনের সিলসিলা বন্ধ থাকে। যাকে فترة الرسل বা 'রাসূল আগমনের বিরতিকাল' বলা হয়।

রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদ ﷺ

প্রায় ১৪০০ বছর আগের কথা। আরব উপদ্বীপের লোকেরা তখন ছিল চরম উশৃংখল আর পাপাচারে লিপ্ত। গোত্রে গোত্রে চলছিল আভিজাত্য আর বংশ মর্যাদার লড়াই। সামান্য কারণেই হত্যা, লুণ্ঠন, দ্বন্দ্ব-সংঘাত আর সন্ত্রাস-নৈরাজ্য লেগেই থাকতো। চারিদিকে তখন হাহাকার বিরাজ করছিল। ঠিক এমন সময়, মানবতার মুক্তির দিশারী সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব ও শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ সারা জাহানের হিদায়েতের জন্য আবির্ভূত হলেন। রাসূল ﷺ হলেন বিশ্বমানবতার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার এক অনন্য রহমতস্বরূপ প্রেরিত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন, وَ مَاۤ اَرۡسَلۡنٰکَ اِلَّا رَحۡمَۃً لِّلۡعٰلَمِیۡنَ "আর আমি তো তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসেবেই প্রেরণ করেছি।" (২১/১০৭)

রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদ ﷺ জাযিরাতুল আরবের মক্কা নগরীর সম্মানিত কুরাইশ গোত্রের বনী হাশেমী খান্দানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আরবী ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর মাঝে প্রেরিত হয়েছিলে। বিশ্বনবী ও শেষনবী হবার কারণেই বিশ্বকেন্দ্র মক্কাতে মুহাম্মাদ ﷺ-কে প্রেরণ করা হয়। তিনি ছিলেন বনী ইসমাঈলের নবী; বনী ইসরাঈলের নয়। রাসূল ﷺ-এর মাধ্যমে নবুয়াতের ধারাবাহিকতা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেছেন,

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَاۤ اَحَدٍ مِّنۡ رِّجَالِكُمۡ وَ لٰكِنۡ رَّسُوۡلَ اللّٰهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَیۡءٍ عَلِيۡمًا

"মুহাম্মাদ তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নয়; তবে আল্লাহর রাসূল ও সর্বশেষ নবী। আর আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ।" (৩৩/৪০)

অন্যান্য নবীদেরকে নির্দিষ্ট জাতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। কিন্তু মুহাম্মাদ ﷺ-কে গোটা মানবজাতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আসবে, সবাই তাঁর উম্মাত হবে। কিয়ামতের দিন একমাত্র তিনিই সুপারিশ করার সুযোগ পাবেন।

রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদ ﷺ যখন পৃথিবীর বুকে আলোকরশ্মি ছড়িয়ে ভূমিষ্ঠ হলেন তখন আপাতদৃষ্টিতে তিনি ছিলেন অনেকটাই নিঃসঙ্গ, অসহায়। তাঁর জন্মের আগেই পিতা আব্দুল্লাহ ফিরে গিয়েছেন আল্লাহর কাছে। তাঁর জন্মের সংবাদ পিতামহ আব্দুল মুত্তালিব শোনা মাত্রই ছুটে চলে আসেন এবং পরম স্নেহ-যত্নের সাথে কোলে নিয়ে কা'বার ভিতরে প্রবেশ করেন। অতঃপর তিনি তাঁর নাম রাখেন মুহাম্মাদ; যার অর্থ প্রশংসিত। তাঁর মাতা গর্ভাবস্থায় স্বপ্নযোগে প্রাপ্ত নামানুসারে তাঁর নাম রাখেন আহমাদ; যার অর্থ উচ্চ প্রশংসিত।

আরবদের রীতি অনুযায়ী, তাঁকে মরুভূমির শুকনো আবহাওয়ায় বেড়ে ওঠার মাধ্যমে সুষ্ঠু গঠনের জন্য ধাত্রী দুধমা হালিমার কাছে রেখে দেয়া হয়। দুধমা হালিমাতুস সাদিয়ার তত্ত্বাবধানে থাকাকালীন রাসূল ﷺ-এর প্রথম বক্ষ বিদারণের বিস্ময়কর ঘটনাটি ঘটে। এই বক্ষ বিদারণের রহস্য ছিল তাঁর কলবকে পবিত্র ও অন্যায় প্রবণতা থেকে মুক্ত করে দেওয়া, যাতে পাপ প্রবণতার শেষ চিহ্ন পবিত্র কলবে অবশিষ্ট না থাকে। এই ঘটনায় দুধমা হালিমা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে রাসূল ﷺ-এর মাতা হালিমার কাছে তাঁকে ফিরিয়ে দিয়ে আসেন। এরপর প্রায় এক বছর মায়ের আদর-ভালোবাসায় কাটানোর পর বয়স

৬ হতে না হতেই তিনি হারালেন তাঁর মাতা আমিনাকে। যেই মা-কে কেন্দ্র করে জীবনের সবকিছু সেই মা হারিয়ে যাওয়ার মানে কি তখনও নিষ্পাপ শিশুটি বুঝতে পারছিলেন না। পিতা মারা যাওয়ার পর থেকে যে পিতামহ তাঁর দায়িত্ব নিয়েছিলেন সেই আব্দুল মুত্তালিবও বছর খানিক পর ইন্তেকাল করলেন। ইয়াতীম শিশু বড় হয়ে ওঠেন চাচা আবু ত্বলিবের সযত্ন-ভালোবাসায়। আপাতদৃষ্টিতে এই বিশ্বের বুকে আট বছরের সেই ছোট্ট শিশুটি যেন ছিল সবচেয়ে একা, সবচেয়ে অসহায়, সবচেয়ে বঞ্চিত। বাস্তবে তাঁর রব তাঁর জন্য প্রস্তুত করে রেখেছিলেন এমন এক বিস্ময়কর অভিযান, যার দীপ্ত প্রভা স্থান কালের বাঁধা ছেদ করে ছড়িয়ে পড়বে সর্বত্র। বহু বছর পর তাঁর রব তাঁর কাছে আয়াত নাযিল করে বলেন,

اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى- وَ وَجَدَكَ ضَاۤلًّا فَهَدٰى- وَ وَجَدَكَ عَاۤئِلًا فَاَغْنٰى

"তিনি কি তোমাকে ইয়াতীম অবস্থায় পাননি? অতঃপর তিনি আশ্রয় দিয়েছেন। আর তিনি তোমাকে পেয়েছেন পথ না জানা অবস্থায়। অতঃপর তিনি পথনির্দেশ দিয়েছেন। তিনি তোমাকে পেয়েছেন নিঃস্ব। অতঃপর তিনি সমৃদ্ধ করেছেন।" (৯৩/৬-৮)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তাঁকে এই পৃথিবীর বুকে একা করে দিয়েছিলেন যেন একমাত্র তিনিই তাঁর পবিত্র ভালোবাসা আর মমতায় তাঁকে লালন পালন করতে পারেন। মহান আল্লাহর বিশেষ রহমতের ছায়ায় বেড়ে ওঠা তিনি তাই কখনো শিরকের ধোঁকার শিকার হননি। তারুণ্যের সেই যাযাবর সময়টাতেও তিনি ছিলেন সব ধরনের অপকর্মের উর্ধ্বে। তাঁর চরিত্রে সবাই এতটাই মুগ্ধ ছিল, তাঁর বিশ্বাসে সবার এতটাই আস্থা ছিল যে তাঁকে সবাই নাম ধরে না ডেকে 'আল আমীন' তথা বিশ্বস্ত ব্যক্তি বলে ডাকতে শুরু করল।

রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদ ﷺ ছোটবেলা থেকেই চাচা আবু ত্বলিবকে মেষ লালন-পালন ও শাম দেশে ব্যবসার কাজে সহযোগিতা করতেন। মক্কার ধনাঢ্য মহিলা খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ (রা.) বিভিন্ন লোককে বিনিয়োগ দিয়ে ব্যবসা করাতেন এবং লাভের একটা অংশ নিজে গ্রহণ করতেন। মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রশংসার কথা জানতে পেরে হযরত খাদিজা (রা.) তাঁর কাছে ব্যবসার প্রস্তাব পাঠান। রাসূলুল্লাহ ﷺ রাজি হন এবং ব্যবসা শেষে অনেক বেশি লাভ সহ খাদিজা (রা.)-এর সমস্ত সম্পদই পূর্ণভাবে বুঝিয়ে দেন। রাসূলের এমন মহৎ গুণ আর অলৌকিক সংকেতের কথা জেনে খাদিজা (রা.) তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান এবং উভয়ের সম্মতিতে তাদের বিয়ে সম্পন্ন হয়। তখন খাদিজা

(রা.)-এর বয়স ছিল ৪০ বছর এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বয়স ছিল ২৫ বছর। যতদিন খাদিজা (রা.) জীবিত ছিলেন ততদিন রাসূল ﷺ আর কোনো বিয়ের প্রয়োজন অনুভব করেননি। এরপর আল্লাহর হুকুমে আরবের বিভিন্ন কুসংস্কারের অবসান ঘটাতে এবং বিভিন্ন পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে তিনি ১১টি বিয়ে করেন। স্ত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন তাঁর চেয়ে বয়সে অনেক বড়, আবার কেউ কেউ ছিলেন অনেক ছোট। স্ত্রীদের মধ্যে আয়িশাহ (রা.) ছিলের রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সবচেয়ে প্রিয়। সকল স্ত্রীর সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল বন্ধুর মতো। আয়িশাহ (রা.)-এর সাথে তিনি দৌড়ের প্রতিযোগিতা করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্যান্য স্ত্রীদের ব্যাপারে মা আয়িশাহ (রা.) যতটা না ঈর্ষাবোধ করতেন, তার চেয়েও বেশি ঈর্ষাবোধ করতেন তাঁর প্রয়াত স্ত্রী খাদিজা (রা.)-এর ব্যাপারে। খাদিজা (রা.) মৃত্যুবরণ করার পরেও রাসূল ﷺ তাঁর সাথীদের সম্মান দেখাতেন। জীবনের শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত তিনি তাদের সম্মান দেখানোর মাধ্যমে তিনি তাঁর প্রথম ভালোবাসার মানুষটাকে সম্মান দেখিয়ে গিয়েছেন। জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময়ে যে মানুষটা ছিল তাঁর সবচেয়ে বড় আশ্রয়, যখন পৃথিবীর বুকে কেউ তাঁকে বিশ্বাস করেনি, এমনকি তিনি নিজেও সন্দেহ করছিলেন যে, তিনি পাগল হয়ে গিয়েছেন কিনা- সেই মুহূর্তে যে মানুষটা নির্দ্বিধায় তাঁকে বিশ্বাস করেছিলেন এবং তাঁকে আত্মবিশ্বাস যুগিয়েছিলেন, যে মানুষটার মর্যাদা এত বেশি যে স্বয়ং আল্লাহ তাআ'লা ও ফেরেশতা জিবরীল (আ.) তাঁকে সালাম জানিয়েছিলেন, সেই খাদিজা (রা.)-এর ব্যাপারে তিনি বলেছিলেন, إِنِّي قَدْ رُزِقْتُ حُبَّهَا "তার প্রতি ভালোবাসার রিযক আমার অন্তরে গেঁথে দেয়া হয়েছে।" (মুসলিম ৬০৬০)

পিতা হিসেবে তিনি ছিলেন পৃথিবীর সকল পিতাদের জন্য এক অনন্য দৃষ্টান্ত। তাঁর আদরের কন্যা ফাতিমা (রা.) তাঁর ঘরে এলে তিনি তাঁকে দাঁড়িয়ে স্বাগত জানাতেন এবং তাঁর কপালে চুমু খেয়ে তাঁকে পাশে বসিয়ে গল্প করতেন।

মানুষের ইহলোৗকিক কল্যাণ ও পরলৌকিক মুক্তির দিকদর্শন মুসলিম উম্মাহর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিয়ামত আল্লাহর বাণী পবিত্র আল কুরআন। এটি বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত মহানবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর জিবরীল ফেরেশতার মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা সুদীর্ঘ ২৩ বছরে নাযিল করেন। কুরআনকে সর্বকালের, সর্বদেশের, সর্বলোকের জীবন বিধান ও মুক্তির সনদ হিসেবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা নাযিল করেছেন। কুরআন নাযিলের ছয় মাস আগে থেকেই আল্লাহ

সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তাঁর প্রিয় হাবীব ﷺ-কে স্বপ্নের মাধ্যমে এই মহান কাজের জন্য প্রস্তুত করে নিচ্ছিলেন। ওহী প্রাপ্তির আগে ধীরে ধীরে তিনি নির্জনতা প্রিয় হয়ে ওঠেন। হেরা গুহায় নিভৃতে আল্লাহ তাআ'লার ধ্যানে তিনি মশগুল হয়ে পড়েন এবং বিশাল সৃষ্টি ও তার উদ্দেশ্য নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনা করতে থাকেন। এভাবে হেরাগুহায় ধ্যানমগ্ন থাকা অবস্থায় ফেরেশতা জিবরীল (আ.) গভীর কণ্ঠে তাঁকে এসে বলল, 'পড়ুন।' প্রিয় রাসূল ﷺ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। উদ্বেলিত কণ্ঠে তিনি বললেন, 'আমি তো পড়তে জানি না।' জিবরীল (আ.) তখন রাসূল ﷺ-কে সজোরে আলিঙ্গন করে বললেন, 'পড়ুন।' রাসূল ﷺ আবার বললেন,'আমি তো পড়তে জানি না।' তৃতীয়বার যখন জিবরীল (আ.) রাসূল ﷺ-কে আলিঙ্গন করে পড়তে বললেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরা আ'লাকের প্রথম পাঁচ আয়াত পড়তে শুরু করলেন।

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ- خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - اِقْرَاْ وَ رَبُّكَ الْاَكْرَمُ- الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ- عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

"পড়ো তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট-বাঁধা রক্তপিন্ড হতে। পড়ো, আর তোমার রব মহামহিম। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে তা শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানতো না। (৯৬/১-৫)

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বয়স যখন ৫১ বছর তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তাঁকে মিরাজ ভ্রমণের মাধ্যমে সম্মানিত করেন। মিরাজের রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে কা'বা থেকে বায়তুল মুকাদ্দাসে যান। বায়তুল মুকাদ্দাসে পৌঁছার পর সেখানে সমস্ত নবী-রাসুলগণ আমাদের প্রিয় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইমামতিতে স্বলাত আদায় করেন। আর এ স্বলাত আদায়ের মাধ্যমে তিনি (ﷺ) হয়ে ওঠেন ইমামুল মুরসালিনা ওয়ান নাবিয়্যিন। এরপর একে একে সাত আসমান অতিক্রম করে সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছেন। অতঃপর আল্লাহর সাক্ষাতের পথে...সিদরাতুল মুনতাহা থেকে উর্দ্ধ জগতে যতটুকু আল্লাহ চেয়েছেন ততটুকু পর্যন্ত তাকে টেনে নিয়েছেন। আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেছেন, "অতঃপর তিনি নিকটে এসেছেন এবং অতীব নিকটবর্তী হয়েছেন। এমনকি দুই ধনুকের মত নিকটবর্তী হয়েছেন, এমনকি আরও অধিকতর নিকটবর্তী হয়েছেন।" (৫৩/৮-৯)

এই মিরাজ সফরেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাদের সকলের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত স্বলাতের বিধান হাদিয়া দেন। মিরাজের রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ জান্নাত এবং জাহান্নামকে স্বচক্ষে দেখে আসেন।

রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর আদেশে মানুষের মাঝে ইসলামের প্রচার শুরু করেন। প্রথমে গোপনে ইসলামের দাওয়াত প্রচার করলেও পরবর্তীতে প্রকাশ্যে দাওয়াত ছড়িয়ে দিতে শুরু করেন। নিচু শ্রেণীর লোকেরা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর দাওয়াতে সাড়া দিয়ে মুসলমান হতে লাগলো এবং ধীরে ধীরে তাদের সংখ্যা বাড়তে লাগলো। দাস শ্রেণীর হওয়ায় তাদের উপর নানা ধরনের জুলুম-অত্যাচার শুরু হয়। নবুয়াতের পঞ্চম বছরে এই জুলুমের আকার মারাত্মক রূপ নিলে রাসূলুল্লাহ ﷺ এই দাস শ্রেণীর নওমুসলিম সাহাবীদের হিজরত করে আবিসিনিয়ায় চলে যেতে বললেন। রাসূলের কথা মতো, বিশাল সংখ্যক সাহাবী আবিসিনিয়ায় হিজরত করলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ বাকিদের নিয়ে অপমান-কষ্ট সহ্য করে মক্কাতেই অবস্থান করলেন। মক্কার কাফির নেতারা রাসূল ﷺ-কে দাওয়াতের কাজ থেকে বিরত করতে দুনিয়াবী নানা প্রলোভন দিয়েছিল। কিন্তু কোনো কিছুতেই নিজের অবস্থান থেকে দূরে সরে আসেননি আল্লাহর রাসূল ﷺ। সত্য প্রচারে তিনি ছিলেন সদা অবিচল। চাচা আবু ত্বলিব নিজে ইসলাম গ্রহণ না করলেও ভাতিজার কাজকে সমর্থন করে যেতেন সবসময়। তাঁর উপর মুশরিকদের কোনো আঘাত-অত্যাচারের আশঙ্কা দেখা দিলে তিনি নিজ ক্ষমতার বলে তা প্রতিহত করতেন। দশম বছরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজা (রা.) ও আশ্রয়দাতা চাচা আবু ত্বলিব ইন্তেকাল করলে তিনি মানসিকভাবে প্রচণ্ড পরিমাণে ভেঙ্গে পড়েন। চাচা আবু ত্বলিবের মৃত্যুকে কুরাইশরা সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করল এবং তাঁর উপর নির্যাতনের মাত্রা পূর্বের চেয়ে অনেক গুণে বাড়িয়ে দিল। এ কঠিন পরিস্থিতিতে সহযোগিতা ও আশ্রয় পাবার আশায় তিনি তায়েফ গমন করলেন। কিন্তু সেখানে উপহাস আর দুর্ব্যবহার ছাড়া আর কিছুই পেলেন না। তায়েফবাসী রাসূল ﷺ-কে পাথর নিক্ষেপ করে রক্তাক্ত করে ফেলে। ফলে আহত অবস্থায় তিনি পুনরায় মক্কায় ফিরে আসেন। কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় কাফেরদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তাঁর প্রিয় হাবীবকে ষড়যন্ত্রের কথা জানিয়ে দেন এবং মদীনায় হিজরত করতে আদেশ দেন। আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী, তিনি আবু বকর (রা.)-কে সাথে নিয়ে মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা হন। পথিমধ্যে কুবা

নামক স্থানে পৌঁছে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকওয়ার ভিত্তিতে ইসলামের সর্বপ্রথম মসজিদ নির্মাণ করেন, যা 'মসজিদে কুবা' নামে পরিচিত। মদীনাতে পৌঁছে রাসূল ﷺ সর্বপ্রথম মসজিদে নববী নির্মাণ এবং আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে ভাতৃত্ব স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

৬ষ্ঠ হিজরীতে নবী (ﷺ) চৌদ্দশত সাহাবী নিয়ে উমরাহ করার উদ্দেশ্যে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। প্রথমে কুরাইশদের খবরাখবর সংগ্রহ করার জন্য একজন গোয়েন্দা মক্কায় পাঠালেন। তিনি জানতে পারলেন যে, কুরাইশরা যুদ্ধের জন্য সর্বোচ্চ প্রস্তুতি গ্রহণ করছে এবং তারা তাঁদেরমে কা'বার কাছেই পৌঁছতে দিবেনা। হুদায়বিয়া নামক স্থানে পৌঁছে নবী ﷺ উছমান (রা.) কে এই খবর দেয়ার জন্য মক্কায় পাঠালেন যে, আমরা যুদ্ধ করার জন্য মক্কায় আসছিনা। উমরাহ পালন করাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। সুতরাং আমাদের পথ ছেড়ে দাও। কিন্তু কুরাইশরা এই কথার মোটেই মূল্যায়ন করলনা। নবী ﷺ এর কাছে খবর পৌঁছল যে, কুরাইশরা উছমান (রা.) কে হত্যা করে ফেলেছে। মুসলমানেরা এই খবর শুনে রসূান্বিত হলেন এবং প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন। তারা একটি গাছের নীচে একত্রিত হয়ে রাসূল ﷺ এর হাতে এই মর্মে বায়আত নিলেন যে, তারা যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত এবং কোনক্রমেই এই হত্যাকান্ডের প্রতিশোধ না নিয়ে মদীনায় ফেরত যাবেন না। কিন্তু একটু পরেই সহীহ-সালামতে উছমান (রা.) মক্কা হতে ফেরত আসলেন। উছমান (রা.) এর আগমনে পরিস্থিতি শান্ত হলো। পুনরায় নতুন করে সন্ধির ব্যাপারে আলোচনা শুরু হলো। ইসলামের ইতিহাসে এটি হুদায়বিয়ার সন্ধি নামে পরিচিত।

হুদাইবিয়ার সন্ধি মোতাবেক সন্ধির পরবর্তী বছর মুহাম্মাদ ﷺ সাহাবীদের নিয়ে মক্কায় উমরাতুল ক্বাযা পালন করতে আসেন এবং এ সময়ই তিনি মক্কার কুরাইশদের মধ্যে নেতৃত্বের শুন্যতা লক্ষ্য করেন। তাদের ক্ষাত্রশক্তির সঠিক পরিমাপ করতে পেরেছিলেন তিনি এবং এজন্যই অধীর ছিলেন মক্কা বিজয়ের জন্য। এর এক বছরের মাথায়ই তিনি তা সম্পন্ন করার জন্য মনস্থির করেন। ইসলামের ইতিহাসে মক্কা বিজয়ের ঘটনা এমন একটি আযীমুশ শান ঘটনা, যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দ্বীন এবং তাঁর রাসূলকে শক্তিশালী করেছেন। অষ্টম হিজরীতে মাত্র ১০ হাজার সৈন্য নিয়ে প্রায় বিনা রক্তপাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নেতৃত্বে মুসলমানরা মক্কা বিজয় করেন। এভাবেই আরবের সবচেয়ে সমৃদ্ধ নগরীতে সত্য ধর্মের গৌরব প্রতিষ্ঠিত হয়। এতদিন যারা ইসলামের শত্রু ছিল বা মুসলমানদের কাছে বন্দী ছিল, তাদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়। কিন্তু

যারা রাসূল ﷺ-কে ব্যঙ্গ করে কবিতা রচনা করত, তাদেরকে হত্যার হুকুম দেয়া হয়, যদিও তারা কা'বার গিলাফ ধরে ঝুলে থাকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজ্বে সকলের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন এবং মক্কাকে পবিত্র ও নিরাপদ নগরী বলে ঘোষণা করেন।
বিশ্বনবী মুহাম্মাদ ﷺ ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সমর বিশারদ সেনানায়ক। সমগ্র দুনিয়াতে একত্ববাদের বীজ বপন করতে এবং ইসলামকে সুসজ্জিত করতে পদে পদে তিনি অনেক বাঁধার সম্মুখীন হন। সেসব বাঁধা তিনি কখনো সন্ধিচুক্তি করে, আবার কখনো সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে মোকাবেলা করেন। ঐতিহাসিকদের মতে, রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদ ﷺ-এর জীবদ্দশায় ২৭টি গাযওয়াহ যুদ্ধ এবং ৬০টি সারিয়াহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

বিদায় হজ্ব থেকে ফেরার পর হিজরী এগারো সনে রাসূলুল্লাহ ﷺ জ্বরে আক্রান্ত হন এবং জ্বরের তাপমাত্রা এত বেশি ছিল যে পাগড়ীর উপর থেকে উষ্ণতা অনুভব হচ্ছিলো। অসুস্থতার এ সময়ে তিনি প্রাত্যহিক নিয়মানুযায়ী স্ত্রীদের ঘরে যাতায়াত করেন। তবে অসুস্থতা তীব্র হলে, তখন স্ত্রীদের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আয়িশাহ (রা.) এর ঘরে অবস্থা লন করেন। নবী কারিম ﷺ এর অসুখ ক্রমেই বাড়ছিল এবং একপর্যায়ে মসজিদেও যেতে পারছিলেন না। সে সময় তিনি হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-কে নামাজের ইমামতি করতে নির্দেশ দেন। হজরত আবু বকর (রা.) নবী কারিমের (সা.) জীবদ্দশায় প্রায় ১৭ ওয়াক্ত নামাজের ইমামতি করেন। (মিরকাত, শরহে মিশকাত)
মৃত্যুর একদিন পূর্বে তিনি তাঁর সামান্য সম্পদটুকুও গরীবদের দান করে দেন।
মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু হলে তিনি বারবার অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলেন এবং এ সময় আয়িশাহ (রা.) রাসূল ﷺ এর মাথা তাঁর উরুর উপর রেখেছিলেন। অবশেষে গোটা উম্মাহকে দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে খাতামুন নাবিয়্যিন, সাইয়্যিদুল মুরসালিন রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদ ﷺ আয়িশাহ (রা.) এর কোলে মাথা রেখে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ঘরের মধ্যে খননকৃত কবরের পাশেই লাশ রাখা হয়। অতঃপর আবুবকর (রা.)-এর নির্দেশক্রমে দশ দশজন করে ভিতরে গিয়ে জানাযা পড়েন। জানাযায় কোন ইমাম ছিল না। প্রথমে রাসূল ﷺ-এর পরিবার-পরিজন, অতঃপর মুহাজিরগণ, অতঃপর আনসারগণ জানাযার স্বলাত আদায় করেন। এভাবে পুরুষ, মহিলা ও বালকগণ পরপর জানাযা

পড়েন। জানাযার এই দীর্ঘ প্রক্রিয়া মঙ্গলবার সারা দিন ও রাত পর্যন্ত জারী থাকে। ফলে বুধবারের মধ্যরাতে দাফনকার্য সম্পন্ন হয়। (ইবনু হিশাম ২/৬৬৪)

তথ্যসূত্র

★ রেইনড্রপ্স মেডিয়া পরিবেষ্টিত অডিও লেকচার সিরিজ "পথিকৃৎদের পদচিহ্ন"।

★ বাসিরা মেডিয়া পরিবেষ্টিত অডিও লেকচার সিরিজ "শ্রেষ্ঠ মানুষেরা"।

★ বই- নবীদের কাহিনী (লেখক- মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল গালিব।)

★ বই- কুরআনে বর্ণিত পঁচিশজন নবী-রাসুলের জীবনী (লেখক- মাও. মুহাম্মদ হাসান রহমতী)

★ লেকচার- প্রফেটস সিরিজ (বক্তা- মিজানুর রহমান আজহারি)

★ www.hadithbd.com